১

প্যাটেল স্মৃতি বক্তৃতামালায় তিনটি বক্তৃতা দিতে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্য প্রথমেই তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে কথারম্ভ করি। আমার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে দিল্লীতে। তাই এখানে এলে আমি স্বগৃহে প্রত্যাগমনের আনন্দ পাই, আমাকে এখানে আনতে খুব বেশী অনুরোধ করতে হয় না। কিন্তু এই উপলক্ষে এসে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত। কারণ এমন একজনের স্মৃতির সঙ্গে আমি আজ নিজেকে জড়িত করবার সুযোগ পেয়েছি যাঁকে আমি জানতুম এবং যিনি আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধারূপে পরম শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও যিনি সুসংহত রাজনৈতিক কাঠামোর দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্বদেশভূমির ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের একজন মহান স্রষ্টা রূপে স্বীকৃত।

এই মহান সর্দারের দূরদৃষ্টি এবং শক্তির বলেই অবিন্যস্ত প্রশাসনিক রাজ্যসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং দেশের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে ৫৫০টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একটি কাঠামোর মধ্যে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল।

তাঁর সংহত দৃষ্টি, খুঁটিনাটি জিনিস সম্পর্কে অদ্ভুত বোধশক্তি, মানসিক দৃঢ়তা, মানুষ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা এবং মহান লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য কার্যপদ্ধতি রূপায়ণের বিরল ক্ষমতা—এই সমস্ত গুণাবলীই এই শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞের কর্মকৃতিত্বে প্রতিভাত হয়েছিল। যে বিরাট দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং যেমন অস্বাভাবিক পরিপূর্ণতায় তিনি তাঁর কার্য সম্পাদনে সক্ষম হয়েছিলেন তাতেই আমাদের জাতীয় জীবনের মহান স্রষ্টাদের মধ্যে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আসুন আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি সপ্রশংস শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে একটা জিনিস যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে আমাদের জাতীয় জীবনের সৌধ কখনই পূর্ণাঙ্গ হয় না। সর্বদাই এই কাঠামো নির্মিতির পথে; এটি বাড়ছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাপক নির্মাণ কাঠামোর অভ্যন্তরস্থিত খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে সব সময়েই বিস্তৃততর করতে হয়, তার অসংখ্য উপকরণগুলিকে দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। কারণ একটির উপর বাকী সবগুলিই পরস্পর নির্ভরশীল।

কেবলমাত্র প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের সংহতি দ্বারাই ব্যাপক সংহতি সাধনের অধ্যায় শেষ হয় না। এ অধ্যায় নিয়ত প্রবহমান। এবং আমাদের জাতীয়

উন্নয়নের ধারায় এই বিরতিহীন নির্মাণ কর্মের অধ্যায়কেই আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছি। কারণ আমরা আমাদের জনজীবনকে লোকায়ত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের ভিত্তিতে এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সংঘবদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। শিক্ষা. প্রকৃত শিক্ষাই, এই গণতন্ত্রের জীবন বায়ু স্বরূপ।

কথাটা হয়তো স্তোকবাক্যের মত শোনাবে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে কথাটা অতি সত্যি।

অন্য ধরনের সমাজ সংগঠন কেবলমাত্র সম্ভ্রান্তদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করে অবশিষ্ট জনগণকে নিজেদের সাধ্যমত শিক্ষালাভের দায়িত্ব তাদের ওপরেই দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে। কিংবা তারা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করেছে। এই উচ্চবংশীয় নাইট, নাগরিক এবং সাধারণ ভদ্রলোক, বিত্তশালী, ব্যবসায়ী ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাদর্শ ছিল। বহু ক্ষেত্রেই এই বিভিন্ন আদর্শগত শিক্ষা একটা সমধর্ম দৃষ্টির মাধ্যমে স্বীয় অংশীদারত্ব গ্রহণ করত। শিক্ষার বিভিন্নতা ধর্মীয় দৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পেত ঐক্যবোধ।

কিন্তু লোকায়ত (ধর্মনিরপেক্ষ) সমাজে তা সম্ভব নয়। কারণ এই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজের যে ব্যাপক সংগঠন রয়েছে তার মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য নেই। প্রাচীন ধরনের শিক্ষাদর্শ গ্রহণ করে প্রত্যেক নাগরিককে একই ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী যেখানে নৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষ্য স্বীকৃত সেখানে এরূপ চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা।

আপাতঃদৃষ্টিতে এমন পরিস্থিতিতে অনতিক্রম্য অসুবিধা মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এটাই হলো শিক্ষার সুযোগ। কারণ এতে গণতান্ত্রিক শিক্ষাদাতা একটা ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের সুযোগ পান যে শিক্ষা অবশ্যই একটা বিশেষ ধরনের অনুযায়ী হবে, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট উপাদান অনুযায়ী হবে ছাঁচে ঢালাই। এতে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে শিক্ষা আসলে ছাঁচে বন্দী করা নয়, শিক্ষার্থীর বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিয়ে তাকে মুক্তি দানই এর উদ্দেশ্য। লোকায়ত সামাজিক গণতন্ত্রে শিক্ষাগত পুনর্গঠনের উপযোগী শিক্ষার ধারা নিরূপণের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জই তিনি পান।

কারণ জাতি হিসাবে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ভারতীয় শিক্ষার নীতি ও আদর্শের ওপর, কীভাবে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এর

দ্বারা সহায়তা হয়, কীভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ হয় এতে, এবং কীভাবে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে সুসমঞ্জসভাবে বিকশিত ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগানো হয়, ব্যক্তিসত্তার গোপন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে কীভাবে নিঃস্বার্থপরতার রহস্যমন্ত্র আনা যায় আয়ত্তাধীনে।

শিক্ষা যদি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়, আমি মনে করি আপনারাও এবিষয়ে একমত, তাহলে কেবলমাত্র প্রশাসনিক খুঁটিনাটি পরিবর্তনে, এক পাঠক্রমে এক বৎসর যোগ করে এবং অন্য পাঠক্রমে এক বৎসর বাদ দিয়ে, একটি বিষয় যোগ করে কিংবা অন্যত্র একটি বিষয় বাদ দিয়ে, নিকৃষ্ট পাঠ্য বই পরিবর্তন করে, সম্ভব হলে নিকৃষ্ট-তর পাঠ্য বই সংযোজন করে কিংবা বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন প্রভৃতি কাজের দ্বারা শিক্ষা পুনর্গঠনের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সক্রিয় সচেতনতার উপলব্ধি এবং তাকে কার্যে রূপায়িত করবার জন্য উদ্দেশ্য ও উপায়ের সামঞ্জস্য বিধান ব্যতীত কেবলমাত্র শিক্ষাযন্ত্রের সম্প্রসারণ দ্বারা এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের শিক্ষা কাঠামোকে সুচিন্তিতভাবে পুনর্গঠন করতে হলে আমাদের শিক্ষার প্রকৃতি এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আরও ব্যাপক ও গভীর উপলব্ধি প্রয়োজন।

প্রথমেই শিক্ষার কথা ধরা যাক। প্রারম্ভেই আমাদের একটা সাধারণ ধারণা দূর করতে হবে যে শিক্ষা হল শূন্য মস্তিষ্কে তথ্যজ্ঞান প্রবেশ করানো। না, শিক্ষা এমন পোশাকী জিনিস নয়, এটা ট্যাবুলা রাসার (Tabula rasa) লিখনও নয়। কোনো রাজনৈতিক আদর্শের নির্দেশে কিংবা কোনো শিল্পনৈতিক বা অর্থনৈতিক পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একতরফাভাবে কোনো এক ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়াও নয়।

গণতন্ত্রে শিক্ষার মূল নীতি হওয়া উচিত শিশুর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দান। কারণ এই শিশুই একদিন পূর্ণ নাগরিক হবে যার বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ এবং সমাজদেহকে নৈতিক দিক দিয়ে নিখুঁত করবার জন্য যার স্বেচ্ছাকৃত অংশ-গ্রহণের ওপরই গণতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভরশীল। গণতন্ত্র হল প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালন। এই যোগ্যতা নিরূপণ হতে পারে শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবণতা আবিষ্কারে এবং তার পূর্ণ বিকাশে।

কী করে এটি ঘটে? শিক্ষা কী ভাবে সম্ভবপর? এ বিষয়ে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই—শিক্ষার প্রক্রিয়া কিংবা মনোজগতের চর্চা, আমার মতে, মানবদেহের

ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানবদেহ যেমন ভ্রূণাবস্থা থেকে শুরু করে গ্রহণীয় ও পরিপাকযোগ্য খাদ্য গ্রহণ, শারীরিক ও রাসায়নিক নিয়মানুযায়ী চলাচল ও ব্যায়ামের দ্বারা পূর্ণাবয়বে পরিণতি লাভ করে, তেমনি মানুষের মন ও মনোজগতের ক্রমবিকাশের রীতি অনুযায়ী মনের খোরাক ও মানসিক চর্চার সহায়তায় প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে পূর্ণ বিবর্তনের ধারায় পরিণতি লাভ করে।

একটা মৌলিক তথ্য যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে ব্যক্তিগত মানুষের মনকেই আমাদের শিক্ষা দিতে হবে; যে মনের খোরাক জুগিয়ে একে বিবর্ধিত করতে হবে তা হলো তার পরিবেশগত সংস্কৃতিরই বস্তু। অপর মানুষের মানসিক প্রচেষ্টার নির্দিষ্টকরণেরই এগুলো হ'লো ফলশ্রুতি। এই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাথমিক উপাদান উপলব্ধি করতে হলে আমাদের মোটামুটিভাবে অনুকরণ করতে হবে শৈশব থেকে শুরু করে ব্যক্তিমনের বিকাশের ধারা।

এ কথা হয়তো বলা বাহুল্য যে প্রতিটি ব্যক্তিমন পৃথিবীতে আসে কতকগুলি সহজাত বোধ নিয়ে। শারীরিক সহজাত বোধের ফলে প্রথমে শারীরিক ক্রিয়াকর্ম দিয়েই তার প্রকাশ হয়। দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরে দেখা দেয় মানসিক প্রক্রিয়া যেগুলো হলো মানসিক সহজাত বোধ ও আবেগের অভিব্যক্তি।

এই শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই শিশু তার প্রথম সন্তুষ্টি ও প্রথম হতাশার অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়। সে কাজ ও জিনিস পছন্দ করতে শুরু করে, তাদের মূল্যায়ণ ও মূল্যনির্ধারণের হয় তখনি সূত্রপাত। এই মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতার সঙ্গে গুণাত্মক ও নঞর্থক মূল্য জড়ানোই হলো অন্য যে কোনো জিনিসের চেয়ে মানসিক পরিণতির মৌল উপকরণ। এই মূল্যায়ণগুলি শিশুর স্মৃতিতে গিয়ে জড়ো হয়, শিশুর মনোজীবনের পথে এক বৃহৎ পদক্ষেপ— উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত হয়।

শিশু তখন তার সীমায়িত কিন্তু নিয়ত বর্ধমান অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তার পছন্দ ও অপছন্দ অনুযায়ী বস্তু ও ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষ করে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রহণ করে উপায় এবং তাদের ওপর মূল্য আরোপণের অভিজ্ঞতা লাভ করে। ক্রমশঃ যে লক্ষ্যগুলির ওপর মূল্য আরোপিত হয় তার সংখ্যা বাড়তে থাকে। আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য লাভের জন্য উপায়ের সার্থকতা তখন উপায়গুলির ওপরেই শিশুর আগ্রহ সঞ্চার করে। আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য লাভের সহায়করূপে উপায়-গুলিও তখন খুবই মূল্যবান হয়ে ওঠে। এভাবে মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং আগ্রহের

একটি চিন্তাপদ্ধতি গড়ে ওঠে ও ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এনে দেয় তার বিশিষ্ট মানসিক কাঠামো।

মানসিক বিকাশের প্রথম স্তরে যে মূল্যবোধের অভিজ্ঞতা হয় সেগুলো একান্ত-ভাবেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত মূল্য। তখনকার মূল্যায়ণে দেখা যায় কেবলমাত্র আনন্দ ও নিরানন্দ, সুখকর ও কষ্টকর, দৈহিক স্বাধীনতা অথবা দৈহিক নিয়ন্ত্রণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ অথবা বিরক্তির অভিব্যক্তি।

কিন্তু এছাড়াও মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তৃতীয় আর এক ধরনের ক্রিয়াকর্ম গড়ে তোলে যাকে আমরা বলতে পারি বুদ্ধিগত এবং নীতিগত ক্রিয়া। এই ক্রিয়া-কর্মের সিদ্ধিও এক ধরনের মূল্যায়ণের অভিজ্ঞতা আনে। কিন্তু সেগুলো উল্লিখিত মূল্যায়ণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নামোল্লেখ করে তার বর্ণনা দেওয়া যায়—সত্য, সুন্দর, শুভ এবং পবিত্র; তার পাশাপাশি রয়েছে দৈহিক স্বাস্থ্য, পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দ, বৈষয়িক লাভ এবং দৈহিক প্রেম। এর মধ্যে কতো পার্থক্য তা এই নামোল্লেখ থেকেই প্রতীয়মান হবে।

এগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিশেষ ধরনের চিরন্তনত্ব, নির্বিশেষ মূল্য এবং যৌক্তিকতা। তাদের আকর্ষণ দুর্নিবার। তাদের রূপায়ণের প্রেরণাও প্রবল। যখনই এই মূল্যবোধ আমাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করে তখনই আমাদের কাছে সেগুলো হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সানন্দে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূল্য-বোধকে তার কাছে গৌণ করে দিই। সেগুলো রূপান্তরিত হয়ে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে।

প্রকৃত শিক্ষার অর্থ হলো শিক্ষার্থীকে এই সমস্ত নির্বিশেষ নৈতিক ও বুদ্ধিগত মূল্য নিরূপণে সহায়তা করা যাতে তারা সেগুলো যথাশক্তি নিজের কর্মে ও জীবনে রূপায়িত করবার প্রেরণা লাভ করতে পারে। মানুষের মধ্যে জৈবিক সত্তা যেমন ক্ষণস্থায়ী আত্মগত মূল্যায়ণে অভিব্যক্ত হয়, তার নৈতিক ও আত্মিক সত্তা তেমনি চিরন্তন বস্তুমূল্য নির্ধারণ ও রূপায়ণে দেয় প্রেরণা। এগুলোই তার অস্তিত্বে আনে সার্থকতা ও উদ্দেশ্যবোধ।

পশুর কাছে জীবনের কোনো অর্থ বা গুরুত্ব নেই, তার কোনো স্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্য নেই, সে শুধুমাত্র নিয়মের অপরিহার্যতায় বেঁচে থাকে।

অপরপক্ষে, মানুষ যখন একবার এই নির্বিশেষ নৈতিক মূল্য উপলব্ধি করে এবং সেগুলো রূপায়িত করবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখনই আসে তার জীবনে অর্থ ও গুরুত্ব—এই নির্বিশেষ মূল্যবোধকে জীবনে রূপায়িত করবার, সংরক্ষণ করবার এক সেবাবৃত্তি। এতেই তার জীবনে ক্ষণমুহূর্ত লাভ করে চিরন্তনত্বের মর্যাদা।

এই সমস্ত নির্বিশেষ মূল্যবোধের যে অভিজ্ঞতা মন লাভ করে সেগুলো তো আসে সংস্কৃতি বস্তুর মাধ্যমেই। এবং এগুলো আবার সৃষ্ট হয় অন্য কোনো কোনো ব্যক্তির বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর মানসিক প্রচেষ্টার ফলে যারা নিজেদের মধ্যে এগুলোর সুনির্দিষ্ট রূপায়ণে সমর্থ হয়েছেন। সমাজের এই সংস্কৃতিবস্তুর দৃষ্টান্ত হলো তার বিজ্ঞান, চারুকলা, প্রয়োগকৌশল, তার ধর্ম, আচারপ্রথা, তার নীতি ও আইনবিধি, সমাজ-সংস্কার, তার ব্যক্তিত্ব, তার বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠানাদি বস্তুনিচয়। এ সমস্ত আবার ব্যক্তিমানস অথবা যৌথ মানসের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক প্রচেষ্টার ফল। মনের বুদ্ধিগত ও নীতিগত মূল্যবোধের বস্তুপ্রেক্ষিত হলো এগুলো। মানুষের নৈতিক সত্তার অভিব্যক্তি হলো এটি।

এই সংস্কৃতি বস্তুনিচয়ের দ্বারাই কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তোলা যায়; এ হ'ল মানবমনের পরিপোষণের একমাত্র খাদ্যবস্তু। এই সাংস্কৃতিক বস্তুনিচয়ের সম্মুখীন হওয়া যায় নিজের পরিবার, বিদ্যালয়, উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান এবং জনজীবনের সর্বাত্মক ক্রিয়াকলাপ এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। ক্রমবিকশিত মন প্রথমে অচেতনভাবেই এগুলোকে গ্রহণ করে এবং পরে সচেতনভাবেই এগুলোর দ্বারা নির্দিষ্ট মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কাজে নিয়োগ করে। এইভাবে ব্যবহৃত হবার পর এই সাংস্কৃতিক বস্তুগুলো শিক্ষণীয় বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে এগুলো ছিল সংস্কৃতির ফল: সংস্কৃত মনের সৃষ্ট বস্তু: এখন সেগুলোই মনকে সংস্কৃত করে, শিক্ষিত করে।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রত্যেক ব্যক্তিমনই একই সাংস্কৃতিক বস্তুকে নিজের মানসচর্চার কাজে লাগাতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার নিজের জন্ম থেকেই তার পারিপার্শ্বিক জগৎ ও বস্তু সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার নিজস্ব পন্থা আছে। আমরা এর কারণ সন্ধান করি তার নিজস্ব দৈহিক ও মানসিক প্রবণতায়। এই বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়ার পন্থা যা তার অনুভূতি, ইচ্ছা, ক্রিয়াকর্ম এবং তার চিন্তা ও বোধশক্তির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় তাকে আমরা অভিহিত করি স্বকীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যরূপে।

এই মৌলিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিভূমিতেই তার পারিপার্শ্বিক বস্তুগত সংস্কৃতি যার বেষ্টনীতেই তার চলাফেরা এবং সত্তা নির্ধারিত ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ গড়ে ওঠে, স্প্র্যাংগার যাকে বলেছেন জীবন-রূপ (Lebens form)। শিক্ষা হলো বস্তুগত সংস্কৃতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিরূপিত আত্মগত পুনরুজ্জীবন। বস্তুজগৎকে আত্মগত মানসে রূপান্তরিতকরণ। কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার নিরিখে সাংস্কৃতিক বস্তুনিচয়ের যে প্রতিরূপ তার ব্যক্তিগত সংহত

চেতনা ও বোধশক্তিতে জাগ্রত হয় তাকেই বলা যায় শিক্ষা। শিক্ষা এই রকম হওয়া উচিত হলে দুটি বিষয় আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ (১) আমার মতে সকল শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই বিবেচনা প্রযোজ্য এবং (২) সমাজের সকলের জন্য যে শিক্ষা তার ক্ষেত্রেও এই বিবেচনা আমাদের করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর কথাই আমি প্রথমে বলব।

যে শিক্ষার আদর্শ আমরা বর্ণনা করলাম তার থেকে যে নীতির উদ্ভব হয় এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যার গুরুত্ব সর্বাধিক অথচ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যে নীতি সাধারণতঃ অবহেলিত তা হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মূল ও সুস্পষ্ট নীতিই হলো ব্যক্তিমানসের চর্চা অথবা শিক্ষা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যদি নিজস্ব মানসিক গঠনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু সমগ্রভাবে কিংবা আংশিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

শিক্ষার্থীর বিশেষ মানসিক গঠন অর্থাৎ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই প্রধান মূল্যায়ণ-উদ্দেশ্য এবং আগ্রহের পদ্ধতিকে নিরূপণ করে। এগুলোই সাংস্কৃতিক বস্তুকে নির্দেশ করে যা অনুরূপ মানসিক গঠনেরই ফল, অনুরূপ মূল্যবোধের প্রতীক, অনুরূপ উদ্দেশ্যের পরিপূর্তি এবং অনুরূপ আগ্রহের রূপায়ণ। এই মূল-উদ্দেশ্য এবং আগ্রহই প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের সামগ্রিক রূপের প্রতিনিধি। সেই হেতু এই আগ্রহ পূরণের প্রচেষ্টাতেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সমস্ত দিক বিকাশ ও পূর্ণতালাভের সুযোগ পায়।

এর পরেই আসে জটিলতর সাংস্কৃতিক বস্তুর উপলব্ধি ও গ্রহণ বৃত্তি। এবং এর দ্বারা মন তার উন্নয়নের পথে ক্রমশঃ শক্তিলাভ করে। স্বভাবতঃই এই আগ্রহ-সমূহ নতুনতর ও সজীবতর গৌণ আগ্রহের সৃষ্টি করে। কখনও-বা এই নতুন আগ্রহগুলোই মূল আগ্রহ থেকে অধিক গুরুত্ব ও আবেগ সঞ্চার করে। তার ফলে ব্যক্তিমানস কাঠামোর অন্যান্য উপাদানের উন্নয়ন ও বিকাশে সেগুলো সাহায্য করে।

একজন কর্মচঞ্চল বালকের মূল আগ্রহ হয়তো ছিল টেকনিক্যাল ও বাস্তব। পরে সেগুলোই তাত্ত্বিক ও সৌন্দর্যবাদী এমনকি ধর্মীয় আগ্রহে রূপ নিল। যে বালক বা বালিকা তত্ত্বগত শিক্ষায় আগ্রহশীল তাকে তত্ত্বগত সাংস্কৃতিক বস্তু ছাড়া আপনি শিক্ষা দিতে পারেন না। এবং সংস্কৃতির অন্যান্য দিক সম্পর্কে তাকে যদি সক্রিয় উপলব্ধি করতে হয় তাহলে মুখ্যতঃ তাত্ত্বিক বস্তুর মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। যে ছাত্রের মন নন্দনবাদী তার মনের প্রকৃত চর্চা একমাত্র নন্দনবাদী বস্তুর মাধ্যমেই হতে পারে। তাকে তাত্ত্বিক কিংবা বাস্তববাদী মানসিক

গঠনের উপযোগী দ্রব্যের সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা হবে ব্যর্থ। কেবলমাত্র নন্দনবাদী বস্তুর সাহায্যেই সংস্কৃতির তোরণ তার কাছে উন্মুক্ত হতে পারে।

একবার যদি শিক্ষার্থীর উপযোগী বিশেষ ধরনের চাবিকাঠির দ্বারা সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন আরও বহু পথ যায় খুলে। কারণ সংস্কৃতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জ নয়; বহু সহস্র যোগসূত্রে তারা পরস্পর সংযুক্ত। চারুকলা থেকে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা, বিজ্ঞান থেকে চারুকলা ও প্রয়োগবিদ্যা, প্রয়োগ-বিদ্যা থেকে বিজ্ঞান ও চারুকলার মধ্যে সহস্রভাবে সহস্র রূপান্তর সম্ভব। কিন্তু কোনো মন থেকে যদি কতকগুলো মানসিক গঠন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক বস্তু দ্বারা সেই মনের উৎকর্ষ বিধান হবে না। সঙ্গীতানুরাগ যার নেই তাকে দিয়ে কোন মহৎ সঙ্গীতের প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধি কিংবা তার সাহায্যে মানসিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। রং সম্পর্কে যার কোনো আগ্রহ নেই শ্রেষ্ঠ চিত্রের মাধ্যমে তার মানসিক উন্নয়নের আশা আমরা করতে পারি না। কর্মচঞ্চল শিশুদের মনের দুয়ার তাই তত্ত্বগত শিক্ষার সাহায্যে উন্মুক্ত করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হই।

কোনো মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষও অপরের মানসিক গঠনে সাহায্য করতে পারে কেবলমাত্র সামাজিক মানস গঠনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে—সহানুভূতি, ভালবাসা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধায়। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষও কেবলমাত্র আমাদের ভাষাতেই আমাদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। সে ভাষা হল আমাদের হৃদয়ের ভাষা, আমাদের বিশেষ মানসিক গঠনের ভাষা। যে ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমাদের বোধগম্য কোনো উপাদান নেই, সম্পূর্ণ অপরিচিত, তার দ্বারা আমাদের কোনো উপকারই হয়তো হবে না। যে ব্যক্তিত্ব আমাদের নিজস্ব মানসিক গঠনের অনুরূপ তা-ই আমাদের মনকে আকর্ষণ করতে পারে, আমাদের বুদ্ধিগত, নৈতিক এবং আত্মিক উন্নয়নে করতে পারে সহায়তা।

শিক্ষার মূল সূত্র হ'লো শিক্ষার্থীর মনের মানসিক-নৈতিক গঠনের সঙ্গে তার শিক্ষা, চর্চা এবং উন্নয়নে সাহায্যকারী বস্তু বা বস্তুর গঠনের সামঞ্জস্য ও সাযুজ্য-বিধান। সিমেল যথার্থই বলেছেন, 'সংস্কৃতি হলো সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ঐক্য থেকে উন্মোচিত, সম্প্রসারিত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত ও সম্প্রসারিত ঐক্যে মনের যাত্রাপথ।'

•

ব্যক্তিমনের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যে পরম মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক গবেষণা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে চাই না। তা সময়সাপেক্ষ এবং বক্তৃতা দীর্ঘ হলে আকর্ষণীয় বস্তুও একঘেয়ে শোনাতে পারে। কিন্তু বিখ্যাত জার্মান

শিক্ষাবিদ জর্জ কার্শেন্‌স্টেনার (Georg Kerschensteiner) যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন সেটুকু উল্লেখ করতে চাই।

তাঁর নামোল্লেখ করবার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে আমি আমার বক্তৃতায় তাঁর কতকগুলি কথা ব্যবহার করবো। তিনি এদেশে খুব বেশী পরিচিত নন। কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে আমার সমগ্র চিন্তাধারার জন্যই আমি তাঁর কাছে ঋণী। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর কাছে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধি করে আমার তাত্ত্বিক কাঠামোকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও গভীরতর করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

কার্শেন্‌স্টেনার প্রত্যেক ব্যক্তির দুটি মূল মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির কথা লক্ষ্য করেছেন ঃ চিন্তাশীল এবং কর্মঠ প্রকৃতি। শুধুমাত্র চিন্তার সঙ্গে কর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। বহির্বাস্তবে কোনো কিছু উৎপন্নও করে না। কিন্তু তার জন্য একে কর্মবিমুখ, নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে সমগোত্রীয় মনে করা চলে না; বহির্বাস্তব জগত থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে তাকে রূপায়িত করবার চেষ্টা এ করে থাকে। শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা এ নয়। চৈতন্যের উপকরণকে এ দেয় যৌক্তিক অর্থসংজ্ঞা; পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং অনুচিন্তার এই অন্তর্মনের ক্রিয়াকলাপ। একে বলা যায় বিশেষ গুরুত্ব দানের দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থপূর্ণ উপলব্ধি, চৈতন্যের জগতে রূপদান ও সৃষ্টিকর্ম। এর সঙ্গে বস্তুতঃই অনেক মননক্রিয়া সংযুক্ত। কার্শেন্‌স্টেনার যাকে সক্রিয় নামে অভিহিত করেছেন সেই মানুষের অন্যান্য মৌল দৃষ্টিভঙ্গির মতো একে সক্রিয় বলা চলে না। কারণ তারা বস্তুজগতে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যকে কার্যে রূপায়ণের প্রয়াসী।

চিন্তাশীল এবং কর্মশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের এই ক্রিয়াকলাপ মুখ্যতঃ অনুকরণশীল অথবা সৃষ্টিশীল হয়। অনুকরণশীল ক্রিয়া, চিন্তায় এবং কর্মে, একেবারে যান্ত্রিক ধরনেরও হতে পারে অথবা অনুকরণীয় বস্তুর উপলব্ধির জন্য চিন্তাজগতেই কাজ পূর্বে শুরু হয়।

ভাবনা এবং কর্ম তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী হতে পারে দ্বিবিধ। কোনো ব্যক্তির অনুভূতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর কিংবা তার কোনো কোনো দিকের উপলব্ধির দ্বারা ভাবনার ক্ষেত্রে পরিচালিত হতে পারেন কিংবা অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে তার কোনো সম্পর্ক দ্বারা এই ভাবনা ক্রিয়া হতে পারে; উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্য অন্তর্ভব কিংবা অতিন্দ্রীয় দুই-ই হতে পারে। প্রথমতঃ এর আগ্রহ থাকতে পারে বস্তুর সত্তা এবং বাস্তবতার প্রতি, কীভাবে তার উদ্ভব এবং বিলুপ্তি; অথবা এর আগ্রহ থাকতে পারে তার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব এবং মূল্যে। ভাবনার এই

দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা বলতে পারি তাত্ত্বিক ঃ প্রথমক্ষেত্রে শুদ্ধ তাত্ত্বিক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্র হেতুগত তাত্ত্বিক। সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক বস্তুনিচয় এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গির বস্তুআরোপণের ফল। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যেই শুধু চৈতন্যের বিযুক্তি আছে তা নয়, যে চিন্তা করছে এবং যা চিন্তা করছে, এবং চিন্তনীয় বস্তুর অবয়ব এবং উপাদানের মধ্যেও এই বিযুক্তি রয়েছে।

যে ক্ষেত্রে চিন্তনক্রিয়া কোনো বস্তুর যৌক্তিকতা কিংবা বাস্তবতার উপর নির্ভর-শীল নয়, কেবলমাত্র তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপই তার বিচার্য, সেখানে ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকলেও বস্তুর অবয়ব ও উপাদানের পার্থক্য দূর হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে চিন্তার দ্বারা বস্তুর উপাদান স্বীকৃত হয় না, হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। একেই বলা হয় নন্দনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এর বস্তুআরোপণেই নন্দনবাদী এবং সংস্কৃতির শিল্পবস্তু উৎপন্ন করে।

যে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অতিন্দ্রীয় মূল্য-সম্পর্কের চিন্তায় সন্তোষ লাভ করে তাকেই বলা হয় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এরই চরম বিকাশে, যেমন মরমীয়া একাত্ম-বোধ, কেবলমাত্র অবয়ব ও উপাদানের পার্থক্যই শুধু নয়, ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্যও, পরমানন্দের ক্ষেত্রের ন্যায়, বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বস্তু-আরোপণের ফলে সৃষ্ট হয় সংস্কৃতির ধর্মীয় বস্তুনিচয়, ধর্মীয় প্রতীক, নীতি আচারানুষ্ঠান এবং ধর্মীয় ব্যক্তিপুরুষগণ। প্রকৃত মরমীয়া কিংবা ধর্মীয় অভিজ্ঞতাই আলোকশিখা প্রজ্জ্বলিত করে যা সারা জীবন থাকে প্রোজ্জ্বল, তাদের সান্নিধ্যে যারা আসে তাদের জীবনে দেয় উত্তাপ এবং আলোক।

চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কর্মশীল দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা এখন করা যাক। এই দৃষ্টিভঙ্গি তথ্যগত সম্পর্ককে বস্তুআরোপ করতে চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি দু'প্রকারের হতে পারে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের স্বরূপ অনুযায়ীই হয় এই শ্রেণী-বিভাগ। কোনো কর্মের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিরূপিত হয় সেই কর্মের দ্বারা কী মূল্য লাভের আশা করা হয় তার দ্বারা। কোনো কর্ম থেকে যে তৃপ্তি লাভ করা হয় তার একটি কারণ যিনি কাজ করছেন তিনি এ থেকে কী মূল্য পাচ্ছেন কিংবা অপরের জন্য কী মূল্য সৃষ্টি করা হচ্ছে; অর্থাৎ কর্মশীল দৃষ্টিভঙ্গি অহং-কেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক, বিপরীত কেন্দ্রিক কিংবা অপর-কেন্দ্রিক হতে পারে। অহং-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য এক হতে পারে জীবনের বৈষয়িক বস্তু অর্জন, সংরক্ষণ কিংবা সম্প্রসারণ, অথবা নিজস্ব নৈতিক ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি-সাধন। প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি অহং-কেন্দ্রিক-বৈষয়িক, দ্বিতীয়টিকে বলতে পারি অহং-কেন্দ্রিক-আদর্শবাদী।

অহং-কেন্দ্রিক কার্যের মূল হলো আত্ম-সংরক্ষণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা। বহু-কেন্দ্রিক কার্যের মূলে সমবেদনা ও মমতা। বহু-কেন্দ্রিক সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি অপর কারো সন্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করে, নিজের নয়, কিংবা এমন কোনো গোষ্ঠীর কল্যাণ যাতে তিনি নিজে যুক্ত নন। অথবা এমন কোনো গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি চাইতে পারেন যে গোষ্ঠীতে তিনি নিজেই একজন সদস্য। প্রথম ক্ষেত্রে পাই পরার্থকামী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। তৃতীয় ধরনের একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিও আছে। যাতে কোনো কর্মের মূল্য কর্মেই নিবদ্ধ, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি বিধান নয়। একে বলা যেতে পারে সামাজিক সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি।

কার্শেনস্টেনার তিনটি মৌলিক ভাবুক শ্রেণীর কথা বলেছেন—তাত্ত্বিক ভাবুক, নন্দনবাদী ভাবুক এবং ধার্মিক ভাবুক: এবং তিন শ্রেণীর সক্রিয় মানুষ—তাত্ত্বিক, নন্দনবাদী এবং ধার্মিক। এর প্রত্যেকটি শ্রেণীর চার রকম বৈচিত্র্য—অহং-কেন্দ্রিক, সামাজিক, পরার্থকামী এবং বাস্তব। বিশুদ্ধ শ্রেণী অবশ্য খুব বিরল: ব্যক্তিত্বের বিবর্তন শুধুমাত্র এই মূল গঠন প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে না, নিজস্ব গঠনে কিরূপ তীব্রতায় এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মিশে যায় তার উপরও অনেকখানি নির্ভরশীল।

একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের ব্যক্তিস্বরূপের এই শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে এত আলোচনা হয়তো কিছুটা একঘেয়ে মনে হবে। তবে আমি এ বিষয়ে সচেতন। যাই হোক, আমি মনে করি যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ দায়িত্ব হলো বিভিন্ন সামাজিক গঠনের আবিষ্কার, মূল্য-উদ্দেশ্য-আগ্রহ প্রথা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সাংস্কৃতিক বস্তুর শিক্ষামূল্যের সন্ধান। এ বিষয়ে অনেক কাজ করা হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষাবিদ মনস্তত্ত্ববিদরা এ ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের পরিধি বিস্তার করতে পারেন। শিক্ষা-নীতি পরিচালক এবং শিক্ষকরা এই গবেষণা কর্মের ফলগুলো নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

এখন আমি দ্বিতীয় নীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতির অনুষঙ্গী হলো শিক্ষার্থীর উন্নয়নস্তর সম্পর্কে বিবেচনা। শিক্ষাধারা একটি প্রবহমান ধারা। এখানে যাত্রাপথটিও গন্তব্যস্থলেরও মতোই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গন্তব্যে কখনও কেউ পৌঁছয় না। প্রত্যেকটি স্তরই তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন স্তরগুলোকে দূরবর্তী কোনো পরিণতির প্রস্তুতি রূপে গণ্য করা সম্পূর্ণ ভুল। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর, স্নাতক কিংবা ডক্টরেট ডিগ্রীকে অযথা এমন উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয় যেন সেটাই শিক্ষার শেষ

কথা। এর ফলে জীবনব্যাপী শিক্ষার আগ্রহ হয় প্রায় অর্থহীন। প্রাথমিক স্তরে যে আগ্রহ ও শক্তি নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে শুরু হয়েছিল অগ্রযাত্রা এর ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেই কেবল চরম লাভের জন্য বর্তমান লাভ বিসর্জন দেওয়া চলে। বিখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ মনীষী শ্লেয়ারমাশের (Schleiermacher) যথার্থই বলেছেন, সমস্ত প্রস্তুতিই বিশেষ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা এবং সমস্ত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাই হলো প্রস্তুতি স্বরূপ।

প্রত্যেক সুসংবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিরই লক্ষ্য থাকবে ছাত্রদের মানসিক উন্নয়নের গতিকে যেন উপযাচক হয়ে প্রভাবান্বিত না করা হয়। বিদ্যালয়সমূহকে যদি মানুষ তৈরীর কারখানা মনে না করা হয় যেখানে মেশিনের মতো তারা পূর্ব-নির্দ্ধারিত কাজ করবে, যদি মনে করা হয় এগুলো শিক্ষাকেন্দ্র তাহলে শিক্ষার্থীর প্রত্যেকটি মানসিক স্তরের উন্নয়নের চরম পরিণতির সুযোগ দিতে হবে এবং যাতে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পদার্পণের চিহ্নগুলো বুঝতে ভুল না করে তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ পেছন থেকে ঠেলে এগিয়ে দেওয়া কিংবা নীচ থেকে টেনে উপরে তোলা দুই-ই শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় আনতে পারে।

কার্শেন্স্টেনার তাঁর 'থিওরি ডের বিল্ডিং'-এ প্রথম জীবনে তিনটি প্রধান উন্নয়ন অধ্যায়ের কথা বলেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের স্থায়িত্ব সাত বৎসর। সাত বৎসর পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়ের তিনি নাম দিয়েছেন খেলার বয়স, দ্বিতীয় অধ্যায় ৭ থেকে ১৪ বৎসর অহংকেন্দ্রিক এবং তৃতীয় অধ্যায় ১৪ থেকে ২১ বৎসর বহু-কেন্দ্রিক কাজের আগ্রহ। প্রত্যেকটি অধ্যায়কেই বিশেষ মূল্য দিতে হবে। একটিকে অপরটির অধীন করলে চলবে না। খেলাধুলার স্বতঃউৎসারিত আনন্দ এবং উদ্দেশ্যহীনতাকে দক্ষতার শিক্ষাদানের জন্য নষ্ট করা উচিত নয়।

খেলাধুলার নিজস্ব সার্থকতা আছে; খেলার বয়সে শিশু তার খেলার বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যের কথা ভাবে না। এমনকি দক্ষভাবে খেলবার কোনো উদ্দেশ্যও সে গ্রহণ করে না। আমরা যদি শুধুমাত্র বয়স্ক না হয়ে আরও বুদ্ধিমান হতাম তাহলে তার খেলাধুলাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতাম যাতে তার এই আনন্দময় ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই বারংবার একই কাজের পুনরাবৃত্তি একটি বিশেষ দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। পরে এই দক্ষতাই তার নিজস্ব লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করতে পারে। এবং তখন সে স্বেচ্ছায় সেই উদ্দেশ্যে দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হবে। খেলাকে যেন দায়িত্বে পর্যবসিত করা না হয়।

খেলার বয়স পার হয়ে প্রায় অলক্ষ্যে আসে অহং-কেন্দ্রিক কাজের বয়স। এ সময়ে গড়ে ওঠে সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্যমূলক, বাস্তববোধসম্পন্ন এবং আংশিক

টেকনিক্যাল, আংশিক সামাজিক কাজের আগ্রহ। খুব বিরল কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া তাত্ত্বিক এবং নন্দনবাদী ভাবনার আভাস তখনও থাকে সুদূরপরাহত। এই বয়সের ছাত্রদের সক্রিয় বাস্তব প্রেরণার রূপায়ণে বিদ্যালয় সমূহের চেষ্টা করা উচিত। বিদ্যালয়ে কার্যপ্রকল্পনা এমনভাবে আয়োজিত হতে পারে যাতে বাস্তব কারিগরী ও সামাজিক প্রেরণা থেকে ছাত্ররা যে আনন্দলাভ করবে তা ছাড়াও পরে তাত্ত্বিক ও চিন্তাশীল ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। এর বিরোধী মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়। উচ্চশিক্ষিত পিতামাতার প্রেরণায় অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রতিভাবান শিশুদের বহুবার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য অপরিণত বয়সেই উঁচু ক্লাসে ভর্তি করে। এবং দূরদৃষ্টি-হীন আমলাতান্ত্রিক ছাঁচে ঢালা মনোভাবের ফলে খরগোসকে কচ্ছপের সঙ্গে পাল্লা দিতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। শিশুর মানসিক উন্নয়নের প্রকৃত স্তরের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গিকে এই উভয় প্রচেষ্টাই সমানভাবে ব্যাহত করে।

এখন তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক্।

প্রথম দুটি বিবেচনাবোধই শিক্ষাদর্শের আভ্যন্তরীণ তথ্য থেকে উৎসারিত। বাহ্যিক সংযোজন নয়। এই বিবেচনাবোধই ব্যক্তিগত সামাজিক গঠন এবং তার উন্নয়নের স্তর অনুযায়ী সমাজপদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন ও সংগঠনের কাজে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় ও চতুর্থ যে বিবেচনার কথা এখন বলবো সেটা শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেটি হলো সামগ্রিকতা এবং কর্মচঞ্চলতা। সামগ্রিকতা সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে বলবো।

সামগ্রিকতার নীতি অনুযায়ী শিক্ষাকর্মের সামগ্রিক প্রভাব শিক্ষার্থীর ওপর পড়বে। শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হবে সমগ্র মানসিক গঠনের উন্নয়নে যাতে সহায়তা হয়, কোনো একটি বিশেষ দিকের নয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পেস্টালোজি (Pestalozzi) বারংবার একথা জন-সাধারণকে বোঝাতে চেয়েছেন যে শিক্ষাকার্য একটি সুসংবদ্ধ ঐক্যরূপ। এর উদ্দেশ্য শিশুর বুদ্ধিগত, নৈতিক এবং শারীরিক শক্তির উন্নয়ন অর্থাৎ মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্তদ্বয়ের সমান উন্নতি বিধান।

আমাদের দেশে গান্ধীজী শিশু-স্বভাব সম্পর্কে তাঁর গভীর ও মমতাময় অন্তর্দৃষ্টির ফলে শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। তিনি তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলেন শিশুদের সম্ভাবনার ওপর, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এর ওপর। তিনি শিক্ষার সম্ভাব্য মাধ্যম হিসেবে কাজের নীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন। অথচ পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত বিদ্যালয় এবং আমাদের

দেশে শত সহস্র বিদ্যালয় ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী শিশুমনে তথ্য ঢোকানো অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাবানদের উন্নয়নের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনবৃত্তি অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় গান্ধী এবং পেস্টালোজি কোনো দিন আমাদের মধ্যে ছিলেন না।

তাঁরা একাজ করছেন তার কারণ শিক্ষণ-নির্দেশ দিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট, শিক্ষার জন্য কোনো আগ্রহ তাঁদের নেই। কোনো কোনো কাজে ছাত্রদের দক্ষতাবৃদ্ধি হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। তারা কি ধরনের মানুষ হয়ে উঠবে সে বিবেচনা তাঁদের কাছে গৌণ, একে তাঁরা সুবিধামত উপেক্ষা করেন।

এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বিদ্যালয় কোনো একজনকে লিখতে শিখিয়েছে। এখন সে একটি অবিস্মরণীয় সনেটই লিখল কিংবা কোনো দলিল জাল করল, এটা দেখা তাঁদের দায়িত্ব নয়। বিদ্যালয় যদি পড়তে শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে কে চিরায়ত সাহিত্যের পাঠক হলো অথবা অশ্লীল সংবাদপত্র পাঠ করতে শিখল এটা দেখা তাঁদের দায়িত্ব নয়। পরীক্ষা পাশ করতে যদি তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সে সৎ কিংবা সত্যবাদী, সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব-সম্পন্ন, শিল্প ও প্রকৃতির সৌন্দর্য সন্ধানী অথবা সকলের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সে বিসর্জন দিতে শিখল কিনা এটা দেখা শিক্ষার দায়িত্ব নয়।

কিন্তু শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি একজন কী হলো শুধু তাই নয়, একজন কী করে তার প্রতিও সমান লক্ষ্য রাখা। দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য তার থাকবেই, কিন্তু এই দক্ষতা কিসের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তার প্রতিও লক্ষ্য থাকবে। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মানস গঠনের চেষ্টাও তাকে করতে হবে। তাই যে বিদ্যালয় ব্যক্তির নৈতিক ও বুদ্ধিগত পরিপূর্ণতা সাধনে প্রয়াসী তাকে শিক্ষার্থীর সমগ্র সত্তা, মূল্য-উদ্দেশ্য ও আগ্রহ পদ্ধতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে হতে হবে সচেষ্ট। এটি করতে পারলেই শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নয়নে সামগ্রিক প্রভাব সক্রিয়ভাবে বিস্তার করা সম্ভব হবে।

এই দায়িত্বপালন সম্ভব করতে হলে বিদ্যালয়কে শুধু শিক্ষার্থীকে কিছু জ্ঞান দান করা ছাড়াও বিচক্ষণভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধিরও কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে হবে।

বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক শিক্ষণের সময়েও ছাত্রদের যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ ও তাদের মন উপলব্ধি করবার শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাতে তাঁরা এই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকার্য পরিচালিত করতে পারেন। কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষাদ্বারাই এর প্রভাব ততটা কার্যকর হবে না, যতটা হয় খেলার মাঠে,

শিক্ষামূলক ভ্রমণে এবং স্কুলের ভিতরে ও বাইরে সচেতনভাবে গড়ে তোলা যৌথ জীবনযাত্রা ও কর্মপদ্ধতিতে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সৃজনধর্মী কর্মের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বিচক্ষণ, মমতাময় পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। এর ফলে ছাত্রদের আগ্রহ সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যাবে তাকে ফলপ্রদ শিক্ষণীয় কার্যে নিয়োগ করা যায় যদি বিদ্যালয়সমূহ ছাত্রদের একটা বিশেষ বয়সগোষ্ঠীর বিশেষ ধরনের আগ্রহ ও বিচিত্রতর ঔৎসুক্যকে স্বীকৃতি দেয়।

২

এই বক্তৃতার শুরুতেই আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা অনেকেই আমার প্রথম বক্তৃতা শুনেছেন। দ্বিতীয়তঃ, আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনারা আমার আগের বক্তৃতার বিষয়বস্তু মনে রেখেছেন।

আগের বক্তৃতায় আমি শিক্ষার সংজ্ঞা বর্ণনা করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের তিনটি প্রধান নীতি বিশ্লেষণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্তরভেদ এবং এর অবিচ্ছেদ্য সামগ্রিকতা সম্পর্কে বলতে শুরু করেছিলাম। আমি কর্মনীতির কথাও উল্লেখ করেছিলাম। এই নীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়েই আজকের বক্তব্য উত্থাপন করবো।

বস্তুতঃ কোনো বিদ্যালয়েই কোনো যুগে ছাত্রদের নিজস্ব-কর্মচঞ্চলতার অভাব ছিল না। এমনকি পঠন, লিখন ও অংক-কষানোর মতো নিষ্ঠুর প্রথা এবং অপরের দয়ায় একজনের মগজে তথ্যের বোমা প্রবেশ করিয়ে ব্যর্থ স্মৃতির স্তূপ তৈরী করবার মধ্যেও কিছুটা নিজস্ব কর্মানুরাগ আছে। কিন্তু সেটা নিতান্তই আকস্মিক। শিক্ষার মূল্য বৃদ্ধির কোনো উদ্দেশ্য এর নেই। শিক্ষার ভাবধারা এবং প্রয়োগপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এই নীতি সার্থকভাবে প্রবর্তন করেন সুইজারল্যান্ডবাসী মহান শিক্ষাব্রতী পেস্টালোজি। বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এই নীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু নীতি গৃহীত হলেও প্রায়ই তার মর্যাদা রক্ষিত হয় না। উৎসাহী সমর্থকরা এর আক্ষরিক অনুসরণ করতে গিয়ে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেন। চতুর সংশয়বাদীরা বিশেষ কোনো কারণে একে এমনভাবে পরিবর্তন করে দেয় যে তার চেহারাই চেনা যায় না। সহজেই তারা এই নীতিকে ধ্বংস করতে পারেন। 'নামটা রাখো, সার বস্তুটা ফেলে দাও' —এই হলো এদের গোপন জবানী। আমাদের দেশেও বহু উৎকৃষ্ট নীতির ভাগ্যে এমন ঘটেছে।

যাই হোক, স্বয়ং-কর্মক্রিয়ার এই নীতি গত শতাব্দীতে ইয়োরোপ এবং আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্তিত হয়। যদিচ এই কর্ম-ক্রিয়া ছিল খুবই সামান্য এবং বাইরে থেকে চাপানো। এ বিষয়টি তখনও সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়নি যে শিশু শিক্ষার্থীরও বোঝবার, উপলব্ধি করবার, কাজ করবার সহজাত প্রেরণা আছে এবং তার মানসিক গঠন অনুযায়ী নিজেকে কাজে লিপ্ত রাখার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা আছে।

বিদ্যালয়সমূহকে একথা বোঝানো খুবই কঠিন যে শিক্ষার অর্থ বাইরে থেকে বিদ্যার ছাপ মেরে দেওয়া কিংবা পোশাক পরিয়ে দেওয়া নয়। প্রকৃত শিক্ষা

হলো আত্ম-শিক্ষা। এ শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষক ছাত্রদের কিছু সাহায্য করবার সুযোগ পান। পেস্টালোজি এ কথাই ভেবেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট জীবনীকার পল নাটোর্প, তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট মনীষী, তাঁর এই কর্মানুরাগ নীতিকে বলেছেন স্বতঃস্ফূর্ততার নীতি।

পরবর্তী কালে অবশ্য এর প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে। 'বইয়ের-স্কুল' থেকে 'কাজের স্কুলে' কিংবা 'স্কুলের সমাজে' যাবার যে শুভ প্রবণতা ছিল তার মধ্যে কিছু অযৌক্তিক মাত্রাতিরিক্ত মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা দেয়। আমি এমন বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখেছি, যেখানে হাতের কাজই একমাত্র কর্মকেন্দ্র রূপে গণ্য, সেখানে কোনোরূপ কাজের চিহ্নই নেই। এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এমন অনেক শিক্ষক বিশেষ আন্তরিকতা এবং গর্বের সঙ্গেই আমাকে বলেছেন যে তাঁদের স্কুলে তাঁরা কোনো বই আনতে দেন না। কারণ তাঁদের স্কুল তো কেবল কাজ ও কর্মানুরাগের জন্যই নির্দিষ্ট।

কী ধরনের কাজ সেখানে করানো হয় একথা আমি আর তাদের জিজ্ঞাসা করিনি। আমি একজন প্রখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদের কথা জানি, প্রথম মহাযুদ্ধের পর শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট পরীক্ষামূলক অধ্যায়ে যিনি তাঁর বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার মেয়েরাই সব কাজ করে। সেখানে শিক্ষকরা থাকেন নেপথ্যে। শিক্ষার প্রতি স্তরেই আমি চাই স্বতঃস্ফূর্ত কর্মানুরাগ—বস্তু নির্ধারণে, কর্ম সংগঠনে, কর্ম তত্ত্বাবধানে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন সেরূপ সকল ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় ত্রুটি সংশোধনে, কাজের ফলাফল বিচারে সর্বত্র। আমি সকল ক্ষেত্রেই তাদের দিই স্বাধীনতা।' সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা এবং কর্তৃত্ববিহীন বিদ্যালয় নির্বোধ এবং নিষ্ফল ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পরিণত হতে পারে। পৃথিবীতে যতই স্বতঃস্ফূর্ততা থাকুক না কেন, এমন কোনো শিক্ষা নেই যেটা কেবলমাত্র নিজেকে ঘিরেই গড়ে উঠতে পারে। সম্ভাব্য থেকে শুরু করে পরিণত মানব ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি সমাজ কিংবা তার সংস্কৃতি-বস্তুর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেননি। এদের সঙ্গে সুনির্বাচিত সংস্পর্শ এবং এদের মধ্য থেকে জাত ক্রিয়াকর্মের ফলকে সমীকরণের দ্বারাই ব্যক্তি মানস জাগ্রত হয় এবং তাঁর সত্তার প্রকৃতি আবিষ্কারে সমর্থ হয়। সৃজনধর্মী এবং স্বতঃস্ফূর্ত শিশুমনের পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অতীত কর্মকৃতি ও দৃষ্টান্ত থেকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা ও তার সমীকরণ। আমার মনে হয় বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

চার রকমের কাজের কথা আমার মনে হচ্ছেঃ মনের খেলার কাজ, প্রমোদক্রীড়ার কাজ, খেয়ালমত আত্মনিয়োগের কাজ, এবং কর্মক্রিয়ার কাজ। মনের খুশিতে খেলা আপনাতেই তার পরিণতি; বাইরের কোনো উদ্দেশ্য তার থাকে না। খেলার জন্যই খেলা। এতে শিশুর মনের বাইরে কিংবা শিশুর মানসিক উপাদানে কোনো কিছু সৃষ্টি করে না। খেলাতেই তার আনন্দ। যদি কখনও মনের কল্পনার স্তর পেরিয়ে যায় এবং এর কোনো একটা অস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে বলে মনে হয়, তখনও সে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট বাস্তবে রূপায়িত হয় না। আপন খেলায় রত শিশুর কল্পনা বস্তু জগতের রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এতে যে কোনো জিনিস দিয়ে যে কোনো কাজ করানো যায়ঃ একটা লাঠিকে মনে করা হয় ঘোড়া, একটুকরো কাগজ হলো ফুল, আর একটুকরো হয়তো হলো ফুলদানি, নিজেই হয়তো হলো শিক্ষক, মা কিংবা ছাত্র এবং দেশলাইয়ের কাঠি হলো মাষ্টারের হাতের বেত। এতেই কাজ ঠিক চলে; শিশু তাতেই খুশী।

অপরপক্ষে প্রমোদক্রীড়া বা স্পোর্ট-এর একটি উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য হলো দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শারীরিক চালনা ও ক্রিয়ার কিছু কিছু সুযোগ। কিন্তু প্রমোদক্রীড়ারও বাইরের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এর উদ্দেশ্য নিজের মধ্যেই নিহিত। চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ কিংবা রেকর্ড করাই এর শ্রেষ্ঠ দক্ষতার মাপকাঠি। যদি প্রমোদক্রীড়ার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, যেমন অর্থার্জন, তাহলে সেটা হলো পেশা, কিংবা স্বাস্থ্যোদ্ধার তখন আর তাকে স্পোর্ট বলা চলে না, সেটা শারীরিক ব্যায়াম।

এ দু'টি ছাড়া অন্য যে ধরনের কর্মানুরাগ, খাপছাড়াভাবে কর্মে আত্মনিয়োগ এবং কাজ, তাদের নির্দিষ্ট বাইরের উদ্দেশ্য থাকে, শুধু নিজেদের মধ্যেই তাদের উদ্দেশ্য নিহিত নয়। তাদের লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট কোনো আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ। খাপছাড়া ভাবে কর্মে নিযুক্তি এবং বিভিন্ন শখ প্রভৃতির উদ্দেশ্য থাকে কর্মের নির্দিষ্ট ফল লাভে। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে কিংবা সার্থকভাবে ফল-লাভের কোনো গুরুতর আশঙ্কা সেখানে থাকে না। যখনই কাজের আনন্দ কমে যায়, এ কাজও তখন বন্ধ হয়ে যায়। কিংবা কাজ যখন কোনো না কোনো রকমে সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই এর বিরতি। যে কর্মের উৎস খেলা এবং যার বিরতি খাপছাড়া কর্মনিযুক্তিতে তার থেকেই সৃষ্ট হয় শৌখীন মানুষের। শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে একে কর্মানুরাগ থেকে কাজের দিকে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়া।

কাজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাকে একটু আলোচনা করতে হবে। কারণ এটাই শিক্ষার অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। হয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র আপনাদের কাছে অতিরঞ্জন বলে মনে হবে। কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখালেই বুঝতে পারবেন যে সকল শ্রেণীর কাজকেই আমি শিক্ষামূলক বলে অভিহিত করিনি। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষকেই কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। অথচ, দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা সকলেই সুশিক্ষিত একথা বলা চলে না। অক্ষরজ্ঞানের বিভ্রান্তিকর দক্ষতা অর্জন না করলেও তারা আমাদের তথাকথিত 'শিক্ষিত' মানুষের চেয়ে সুশিক্ষিত। সকল কাজই শিক্ষামূলক নয়। যদিচ শিক্ষামূলক কাজই প্রকৃত শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। এই বিপরীতধর্মী উক্তি ব্যাখ্যা করতে হলে আমাকে বলতে হবে শিক্ষামূলক কাজ বলতে আমি কী বুঝি—কাজ বলবো তাকেই যা মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে মানসিক চর্চায় সহায়তা করে।

প্রথমেই একটা জিনিস আমাদের সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, যতই আগ্রহ, ঔৎসুক্য এবং পরিশ্রমের সঙ্গে করা হোক না কেন, কখনই শিক্ষামূলক কাজ হতে পারে না যদি সে কাজ মানসিক ক্রিয়ার প্রস্তুতি থেকে উদ্ভূত না হয়। সেটাই হলো সে কাজের প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ। শারীরিক পরিশ্রমের কাজের এই অত্যাবশ্যক উপাদানই একে শিক্ষামূলক করে তোলে। কায়িক শ্রমের কাজ যত অগ্রসর হয়, এই প্রথম বুদ্ধিগত নিশ্চিত পদক্ষেপ পরিবর্তিত কিংবা সংশোধিত হতে পারে। কিন্তু সমস্ত শিক্ষামূলক কায়িকশ্রমের আগে এটি অবশ্য থাকা চাই। শ্রমিকের মনোজগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কেবলমাত্র যান্ত্রিক ধরনের কাজ কখনই শিক্ষাপ্রদ হতে পারে না। অপরপক্ষে, কেবলমাত্র অনুকরণবৃত্তিই শিক্ষাপ্রদ হতে পারে না। কোন জিনিস অনুকরণ করতে হবে আগে সেটা ভালভাবে বুঝে নেওয়া চাই।

শিক্ষামূলক কাজের সাধারণতঃ চারটি স্তর আছেঃ কী করতে হবে সে সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট চেতনা; কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুতি, উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ, যে যে ধাপে কাজটি করা হবে তার সুচিন্তিত ধারণা; বাস্তবে কাজটি সম্পূর্ণ করা এবং এক নম্বর স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন কাজের ফল সম্পর্কে আত্মসমালোচনা। একেই বলা হয়েছে বস্তুরূপায়ণের চারটি স্তর। শিক্ষামূলক কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র তৃতীয় স্তর, কাজটির প্রকৃত রূপায়ণই আসলে কায়িক। অপর তিনটি স্তর মানসিক শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। অ-কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে চারটি স্তরই মুখ্যতঃ মননজগতের কাজ। এই মানসিক কর্মের সঙ্গে একটুকরো কায়িক শ্রম কিংবা

কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা একটি নীতিগত প্রশ্নের সমাধান অথবা তত্ত্বগত কোনো সমস্যার সমাধানও জড়িত থাকতে পারে। এতে পরবর্তী জীবনে অনুরূপ কোনো সমস্যার সহজে এবং অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য মনকে শিক্ষা দেয়। এর ফলে মানসিক বিচক্ষণতা এবং যৌক্তিক চিন্তার ধারা উন্নয়নে সহায়তা হয়। যদিও এটিই সমগ্র শিক্ষা নয়, তবু শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট পদক্ষেপ। কারণ শৈশবাবস্থায় চিন্তন-বৃত্তির যে স্তর প্রকাশ পায় সেই স্তরেই তাকে থাকতে দেওয়া নাও হতে পারে।

শিশুর অভিজ্ঞতা যত বাড়তে থাকে, সে সেগুলোর মধ্যে একটা শৃংখলা আনতে শুরু করে। সে কথা বলতে শেখার এবং শব্দ-প্রতীক গ্রহণের অনেক আগেই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা, পার্থক্য এবং পরিচয় করতে শেখে। যখনই সে তার সহজাত কর্মপ্রেরণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শেখে, তখনই সে যে কেবলমাত্র যৌক্তিক উপায় ও উদ্দেশ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করে তা নয়, সে কার্য ও কারণ, আকৃতি ও বাস্তব; অংশ এবং সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই সম্পর্কগুলি সত্য কিনা, বস্তুনির্দেশক প্রতীকগুলো দ্ব্যর্থহীন কিনা এবং প্রকৃতির অন্যান্য বিষয় শিশুমনকে বিক্ষুব্ধ করে না। অত্যন্ত ভাসা ভাসা উত্তরেই তার মনের অবিশ্রান্ত প্রশ্নধারা সাময়িক ভাবে শান্ত হয়। সে যে যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছে তাকে নিশ্চিত করবার জন্য সে শুধু একটি উত্তর চায়। শিশু বিচার করতে চায় এবং সে বিচারের সঙ্গে স্বাভাবিক সিদ্ধান্তগুলোকে যুক্ত করে দেয়। তার সিদ্ধান্তগুলো যৌক্তিক কিংবা ন্যায়সঙ্গত কিনা তা নিয়ে সে চিন্তা করে না। তার চিন্তাপদ্ধতিতে শৃংখলা নেই। সেই চিন্তাপদ্ধতিকে আরও নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য সে চেষ্টা করেনি।

এর বিপরীত রয়েছে অংকে এবং সাধারণ যুক্তি বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যৌক্তিক চিন্তাধারা। নিশ্চিত ধারণা থেকে এখানে চিন্তার প্রবাহ আসে। এগুলো হয় স্পষ্টতঃই গ্রাহ্য অথবা ইতিপূর্বে সত্য বলে প্রমাণিত। উভয়েই সুস্পষ্ট স্বতঃসিদ্ধ থেকে জাত এবং সুনিশ্চিত চিন্তাধারার অনুগামী। মন বাস্তব জিনিস থেকে চিন্তাধারা গ্রহণ করে না। নিজের সত্তা থেকেই এর উদ্ভব।

কিন্তু আরও বহু বিচিত্র বাস্তবের সম্মুখীন হয় মানুষ যা তার অন্তরসত্তা থেকে উদ্ভূত নয়। কর্মের ও কর্মপদ্ধতির অভিজ্ঞতা থেকে সে ধীরে ধীরে সে সম্পর্ক অবহিত হয়। বহির্বাস্তবতাকে কার্যে নিযুক্ত করতে হলে তাকে তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে হয়। এ জন্যে তার প্রয়োজন হয় যুক্তিবাদী চিন্তাপদ্ধতি। সযত্ন

শিক্ষা দ্বারা সে বস্তুগত চিন্তার অভ্যাস লাভ করে। সুনির্ধারিত সম্পর্ক গড়ে তোলে যৌক্তিক বিশ্লেষণবাদী ও সমন্বয়বাদী বিচারে উপনীত হতে পারে।

শিশুর মনের সরল ও সহজে সন্তুষ্ট যৌক্তিক চিন্তাধারাকে সযত্ন আত্মবিশ্লেষণকারী এবং সুশৃংখল চিন্তাধারায় পরিণত করতে সহায়তা করতে হবে। কারণ, সযত্ন অন্তর্দৃষ্টির অভ্যাস যদি গড়ে তোলা না যায়, তাহলে আবেগপ্রবণ, বাহ্যিক এবং দ্রুত চিন্তাপদ্ধতির অভ্যাস গড়ে উঠবে। যদি সত্য নির্ণয়ের জন্য বিলম্বিত বিচারের অভ্যাসকে মনে স্থান দেওয়া না হয়, তাহলেই সন্দেহজনক অবিশ্বাস-প্রবণতার মধ্যে সহজেই বিশ্বাসপ্রবণতার অভ্যাস গড়ে উঠবে। চিন্তাধারায় যত্ন, দৃঢ়তা এবং পরিপূর্ণতা আনতে হলে সেগুলো অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। এই ধরনের মানসিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনের সুযোগ বুদ্ধিগত পুস্তক-বিদ্যালয় এবং হাতে-কলমে কাজের বিদ্যালয় উভয়ত্রই অবহেলিত হতে পারে এবং হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে যে ধরনের কার্যক্রমই গ্রহণ করা হউক না কেন, উপরি-উক্ত কার্যসূচীর যথোচিত সুযোগ না দিলে প্রকৃত শিক্ষা সেখানে হবে না।

যে সকল বিদ্যালয় তাদের কাজ কেবল তথ্য পরিবেষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে আবদ্ধ রাখে তারা প্রায়ই এই প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক কাজটিকে তাদের প্রধান কর্তব্যরূপে অবহেলা করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা জড়িত আছেন তাঁরা শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন যে শিক্ষাতথ্য এবং দক্ষতা প্রকৃত শিক্ষা নয়। বস্তুতঃই শিক্ষাতথ্য এবং দক্ষতা শিক্ষা বিচারের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠিও নয়। এগুলোকে কার্যোপযোগী করতে হলে আমাদের একটি পার্থক্য বিধান করতে হবে। তথ্য দ্বিবিধ হতে পারে। এই তথ্য অন্য কারো জ্ঞান তার নিজস্ব মানস-প্রক্রিয়া দ্বারা অর্জিত হয়ে আমাদের কাছে একেবারে প্রস্তুত দ্রব্যের মতো আসতে পারে। অথবা এই জ্ঞান আমাদের নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে।

অনুরূপভাবেই দক্ষতাও দুই প্রকারের হতে পারে। অনুকরণের বুদ্ধি দ্বারা বর্তমান মূল্যের পুনরাবৃত্তির যান্ত্রিক দক্ষতা, অথবা নিজস্ব শক্তি দ্বারা নূতন মূল্য সৃষ্টির অ-যান্ত্রিক দক্ষতা। প্রথমোক্ত তথ্য ও দক্ষতা বাইরে থেকে আহৃত বস্তু। দ্বিতীয়োক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা নিজস্ব শক্তিরই রূপায়ণ। প্রথমোক্ত বস্তু বাইরের সংযোজন, দ্বিতীয় অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। প্রথম জিনিসটি শিক্ষাগ্রহণ, দ্বিতীয়টি শিক্ষা-উপলব্ধি। প্রথমটি বাহ্যিক চাকচিক্য, দ্বিতীয়টি আত্যন্তিক সংস্কৃতি।

কেউ কেউ এমন অতিরঞ্জিত দাবী করেন যে আদর্শ বিদ্যালয়ে একমাত্র কাজই হবে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকলাপ। প্রচলিত জ্ঞান এবং যান্ত্রিক দক্ষতাকে তাঁরা কর্ম-

সূচীর বাইরে রাখতে চান। আমার মনে হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেন যে প্রত্যেক শিশুই একটি সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাকৃত কাজের উদ্দেশ্য হলো একজনের পূর্ণ সত্তাকে ঘিরে রাখা এবং প্রচলিত জ্ঞান ও যথেষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জনে প্রেরণা দান। নতুবা স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকলাপের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর হতে বাধ্য। চিরাচরিত জ্ঞান ও যান্ত্রিক দক্ষতা, সেইহেতু, সর্বদাই শিক্ষাকর্মে স্থান পাবে। তবে তার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের অথবা সৃজনীধর্মী কাজের দ্বারা দক্ষতা অর্জনের শূন্যস্থান পূরণ। শিক্ষামূলক কাজকে সব সময়েই চিরাচরিত জ্ঞান এবং যান্ত্রিক দক্ষতা দিয়ে আরও বাড়াতে হয়, শক্তিশালী করতে হয়।

এখন আপনাদের সামনে শিক্ষা-মূল্যের সঙ্গে জড়িত একটি জরুরী এবং অপরিহার্য প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। এবং দাবী হল মানসিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ দান যার সাহায্যে শিক্ষার্থী তার সযত্ন অনুশীলিত যৌক্তিক চিন্তাধারার প্রয়োজনীয় স্বভাব গড়ে তুলতে পারে। মনের ক্রিয়াকলাপের জন্য এটা হল একটা মৌলিক শিক্ষা। এতে মানসিক এবং বুদ্ধিগত দক্ষতা সৃষ্টি হয়। যে কাজ এই গুরুত্বপূর্ণ ফল এনে দেয়, তাকে কি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষামূলক বলা চলে? এর সম্মতিসূচক উত্তর আমি দিতে পারবো না।

দক্ষতা এবং গুণাবলীকে প্রকৃত শিক্ষার ফলরূপে তখনই স্বীকৃতি দেওয়া যায় যদি সেগুলো অর্জিত হয় এবং বস্তুগত মূল্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। নির্ভুল যৌক্তিক চিন্তাধারার দক্ষতাপূর্ণ স্বভাবের অধিকারী এমন লোক হতে পারেন যিনি কোনোদিন হয়তো নিজের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে আসেননি, কখনও মহৎ ভাবধারায় ভাবিত হননি, কখনও কোনো মহৎ প্রেরণায় উজ্জীবিত হননি, কখনও ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হননি। · এমন লোক সে দক্ষতা অর্জন করতে পারে যে সমাজ-বিরোধী, দুষ্কৃতিমূলক কাজের উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষিত মানুষের চরিত্রের সৌন্দর্য হবে সংস্কৃতির বস্তুর প্রতি, অর্থাৎ চরম বস্তুগত মূল্য-বোধের প্রতি একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি। সেই দৃষ্টিভঙ্গিই হওয়া উচিত শিক্ষাগত এবং উপদেশমূলক কার্যকলাপের আকাঙ্ক্ষিত ফল।

কার্শেন্‌স্টেনার তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থে (Begriff der Arbeitschule) যথার্থই বলেছেন যে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের পাঁচটি নির্ভুল নিদর্শন থাকবে। সেগুলো হলো নিম্নরূপঃ

১। শিক্ষিত মানুষের মনের দিগন্ত থাকবে প্রসারিত। বস্তু ও মানুষের মূল্য-বোধ সম্পর্কে থাকবে উদারতা।

২। কোনো বিষয়ে তিনি দৃষ্টিরুদ্ধ করে রাখবেন না। তাঁর থাকবে প্রাণবন্ত খোলা মন। নূতন মূল্যবোধ এবং ভাবধারা সম্পর্কে তার থাকবে গ্রহণ-ক্ষমতা। তিনি বিকৃতরুচিবাদী ন'ন।

৩। নৈতিক উন্নয়নের জন্য তাঁর থাকবে আন্তরিক প্রেরণা। সর্বদাই তিনি পূর্ণতার প্রয়াসী। তিনি কখনই আত্মম্ভরী হবেন না। কখনই একথা তিনি মনে করবেন না যে তিনি সর্বোচ্চ শীর্ষে পেঁাছে গেছেন।

৪। মূল্যবোধের সঙ্গে তাঁর থাকবে সর্বতোমুখী এবং পরিবর্তনশীল সংযোগ। কোনো বিষয়েই তাঁর কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না, থাকবে না আমলা-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।

৫। কার্শেনস্টেনার শিক্ষার সংজ্ঞাস্বচ্ছদৃষ্টি উৎসারিত। তার কর্ম, চিন্তা এবং অনুভূতিতে তার প্রকাশ থাকবে সুপরিস্ফুট।

কার্শেনস্টেনার শিক্ষার সংজ্ঞা-নির্দেশে বলেছেন ঃ সংস্কৃতির বস্তুদ্বারা জাগ্রত ব্যক্তিগতভাবে সুসংহত মূল্যবোধ। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে সংস্কৃতির বস্তুর ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। কারণ এগুলোর মধ্যেই বস্তুগত মূল্য-বোধ জড়িয়ে থাকে এবং সংরক্ষিত থাকে। এগুলোর মাধ্যমেই ক্রমবর্ধমান ব্যক্তি-মানস সেই মূল্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এবং সংস্কৃতির বস্তুসমূহে যে শক্তি সুপ্ত থাকে সেগুলো ব্যক্তিগত মানসে জাগ্রত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই মূল্যবোধ গ্রহণ ও স্বীকৃতিই 'বস্তুকেন্দ্রিকতা', যৌক্তিক বস্তুগত মূল্যের কাছে ব্যক্তিগত মানসকে গৌণ করবার সম্মতি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, হাতের বা মনের যে কাজ কোনো কর্মী বস্তুকেন্দ্রিকভাবে করতে চেষ্টা করে তাকেই বলা চলে শিক্ষামূলক কাজ। বস্তুকেন্দ্রিকতাই, যথার্থভাবেই বলা হয়েছে, আসলে নৈতিকতা। বস্তুতঃ নৈতিক ব্যবহার কাকে বলবো? ব্যক্তিগত প্রবণতা ও স্বার্থের পরিবর্তে বস্তুগত মূল্য গ্রহণের আগ্রহ। বস্তুকেন্দ্রিকতার উদ্দেশ্য হলো মূল্যসমূহের পরিপূর্ণ উপলব্ধি। ব্যক্তিনিরপেক্ষতাই বস্তুকেন্দ্রিকতা।

কোনো ব্যক্তির কর্মপদ্ধতিতে এই বস্তুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে গড়ে ওঠে? প্রকৃত শিক্ষার পথে কীভাবে কোনো মানুষ পরিচালিত হয়? ইতিপূর্বে এই আলোচনাতেই চার রকমের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করেছিঃ খেয়ালখেলা, স্পোর্ট, অনিয়মিত কর্ম-নিযুক্তি এবং আন্তরিক কাজ। এই সব ধরনের কাজেই যে কর্মী তিনি সার্থক ও ব্যর্থ মূল্যবোধের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। এই সব ধরনের কাজই কর্মীর মনে কোন না কোন ধরনের কর্মপ্রবণতা গড়ে তোলে। কিন্তু আপনারা আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবেন যে এই চার ধরনের কর্মবৈশিষ্ট্যের

মধ্যে একমাত্র যেগুলো প্রকৃত 'কাজ', সেগুলোরই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষাগত মূল্য থাকে। কেবলমাত্র আন্তরিক আগ্রহশীল কর্মের মাধ্যমেই কর্মী যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়।

অসম্পূর্ণ, অযত্নকৃত, অসমাপ্ত কাজ নিশ্চয়ই শিক্ষামূলক নয়। পরিপূর্ণ সিদ্ধি এবং পরিপূর্ণতাই, আমার মতে, সর্বোচ্চ আনুষ্ঠানিক মূল্যসম্পন্ন। কোনো কোনো কাজের মাধ্যমে অন্যান্য কাজের চেয়ে এই পরিপূর্ণ মূল্য উপলব্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব।

যে কাজের দ্বারা কর্মীর সক্রিয় আত্মসমালোচনা সম্ভব সেগুলোই এই উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর উপযোগী। কারিগরি কাজের এই ধরনের সুযোগ অত্যন্ত বেশী।

যে বিদ্যালয় তাদের কাজ শিক্ষামূলক করতে চায় তাকে পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হবে তাদের ছাত্রদের যাতে তারা আনন্দদায়ক ও প্রাণোচ্ছল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিপূর্ণতার মূল্য উপলব্ধি করতে পারে। পরিপূর্ণতার প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে অহংকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য দ্বারা, বস্তুকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যের সাহায্যে নয়। কিন্তু পরিপূর্ণতা সাধনের এই অভিজ্ঞতা, বারংবার পুনরাবৃত্তির ফলে, এই উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করতেও সক্ষম হয়। যেই মুহূর্তে এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তখনই পরিপূর্ণ ফল লাভের জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য উপায় গ্রহণের আশংকাও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বস্তুর মাধ্যমেই এ সম্ভব হয়। কোনো কারিগরি পদ্ধতি, কোনো বিদেশী ভাষা অথবা বিজ্ঞানের কোনো শাখা, কোনো ব্যক্তির জীবনী পাঠ, কোনো কবির কাব্য ইত্যাদি। শিক্ষার্থী এই উপায়গুলো আয়ত্তে আনবার প্রেরণায় এগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে। এই বস্তুনিচয়ের অভিজ্ঞতা সে অর্জন করে।

যে মূল্যবোধগুলো তার মানসিক প্রবণতাকে জাগ্রত করে সেগুলোই তাকে কর্মে প্রণোদিত করে, তার মূল্যগুলো যতটা সম্ভব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির কাজে সাহায্য করে। এই আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবার পর মূল অহংকেন্দ্রিক প্রবণতা বিভিন্ন মূল্যবোধের উদ্দেশ্যের মধ্যে যায় মিশে এবং তার বাহ্যিক মূল্যের পরিপূর্ণতা লাভের জন্যই হয় প্রচেষ্টা।

আমি বোধ হয় এই চতুর্থ সংজ্ঞা নিয়ে একটু বেশী সময় কাটিয়েছি। কারণ আমার ধারণা, আমি পূর্বে যে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি তা থেকেই এটি উদ্ভূত।

গত দুই দশক ধরেই আমরা জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর ভিত্তিরূপে কাজের-স্কুলের চিন্তাধারা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। এখন সমস্ত অস্পষ্ট ধারণা বাদ দিয়ে বিষয়টিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করা দরকার। গোড়াতেই এই মন্তব্য দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম: 'শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হলো কাজ।' শিক্ষা-মূলক কাজ, এমনকি কায়িক পরিশ্রমের কাজও মানসিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একে অবহেলা করলে সমস্ত কাজেরই শিক্ষামূলক গুণাবলীকে করা হবে অবহেলা; কাজ মাত্রেই শিক্ষামূলক। কারণ এর দ্বারা সযত্ন চিন্তাপদ্ধতি গড়ে তোলা যায়। বস্তুকেন্দ্রিক কাজই শিক্ষামূলক এবং যদি তাকে সম্ভাব্য পরিপূর্ণতায় উপনীত করবার প্রেরণা থাকে। কাজের ফলাফল নিয়ে যদি আত্ম-সমালোচনার সুযোগ থাকে, তাহলে কাজের শিক্ষামূলক দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। কায়িক এবং কারিগরি কাজের মাধ্যমেই এই সুযোগ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

এখন আমি শিক্ষার আরও দুইটি নীতি নিয়ে আলোচনা করবো। প্রত্যেক শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই নীতিগুলো প্রযোজ্য। এর প্রথম নীতি হলো শিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব। যে নীতিগুলো এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি তাতে ব্যক্তিকেই বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি তাতে নেই। সামাজিক পরিবেশের সংস্কৃতির বস্তুনিচয়ের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং সমীকরণের মধ্য দিয়েই প্রতিটি ব্যক্তিমানসের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন হবে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে 'একটি রজতসূত্র, একটি রেশমী বন্ধন' স্থাপন করেছি। কিন্তু আমরা এতদিন ব্যক্তি-মানসের এবং স্বাধীন নৈতিক ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপরও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। এখন আমরা এই নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি যে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে আরও সুন্দর, আরও ন্যায়পরায়ণ করে গড়ে তোলা।

এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে যৌথ সামাজিক অস্তিত্বের সমপর্যায় অগ্রগতি ব্যতীত ব্যক্তিমানসের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে না। ব্যক্তি-গত সমুন্নতি যার কাম্য, তাকে অবশ্যই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিচার করতে হবে। প্লেটোর মতো দ্রষ্টা পুরুষকেও ব্যক্তির গুণ বিচারের জন্য সমগ্র সমাজের কাঠামো ও উন্নয়নকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল। সমাজের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত হয় অতীতের মানুষের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট সংস্কৃতির বস্তু। সমাজের মানুষের শিক্ষামূলক ব্যবহারের জন্যই এগুলো রাখা। সমাজের মানুষেরই দায়িত্ব এই

ঐতিহ্যের বস্তুগুলোকে সমৃদ্ধতর করা, তাকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা, উজ্জ্বলতর করা এবং আরও নিত্যনতুন অর্জনে তাকে মহত্তর করে তোলা।

কিন্তু ব্যক্তিপুরুষ যদি সমাজের প্রতি কোনোরূপ দৃষ্টি না রেখে, সমাজ সংস্থায় তার ক্রিয়াকর্মের মূল্যোপলব্ধি উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নিজস্ব মানসের নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নে আগ্রহী হয়, নিজস্ব সত্তার সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে নিযুক্ত থাকে তাহলে হয়তো তিনি তাঁর আত্মিক সত্তার পূর্ণতা লাভে সক্ষম হতে পারেন। কিন্তু সকলেই যদি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাহলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমস্ত পথ, এমনকি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও, হয়ে যাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, বন্ধ্যাজমির বিষণ্ণ গলিপথের তুল্য। এবং আত্মকেন্দ্রিক, অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত, নৈতিক দিক দিয়ে মুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বও সম্ভবতঃ, এই বন্ধ্যাজমির কোনো অনুর্বর পর্বত-গাত্রে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিচরণ করতে বাধ্য হবে।

এইরূপ বিচ্ছিন্ন কিন্তু অনুর্বর নৈতিক বিশিষ্টতার পরিচয় প্রায় সব সমাজেই পাওয়া যায়, এমনকি গণতান্ত্রিক সমাজেও। যে সমাজে খুব আর্থিক অসাচ্ছল্য নেই, তাঁরা এই ধরনের বিচ্ছিন্ন বন্ধ্যা কৃতী মানুষের নমুনাকে সমর্থন করতে পারেন, উৎসাহও দিতে পারেন। কারণ, তাঁরা হয়তো মনে করেন যে এমন বিচ্ছিন্ন সুস্থ জীবনের দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র তার অস্তিত্বের দ্বারাও, শিক্ষামূলক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু অল্প কয়েকটি অসাধারণ ক্ষেত্রেই তা হতে পারে। সমাজে যারা স্পষ্টতঃই শোষণকারী এবং অবসরভোগী মুষ্টিমেয় সেই কয়জনই বহুসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই আভিজাত্য পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভোগ করে থাকে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার দেহ, মন ও আত্মার উন্নয়নের জন্য সহ-নাগরিকদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। অতএব সমাজের জীবন-যাত্রাকে নৈতিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে সুস্থতর করে তোলবার দায়িত্বেও সানন্দেই তাকে অংশীদার হওয়া কর্তব্য। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই উচ্চতর মূল্যার্জন যথেষ্ট নয়; সমাজকেও সাহায্য করতে হবে। সংগঠিত সামাজিক সত্তার প্রতিও থাকতে হবে আনুগত্য। সম্ভাবনাময় সংস্কৃতির বস্তুসমূহের অভিজ্ঞতা এবং তার স্বীকৃতি ব্যক্তিগতভাবে গঠিত মূল্যবোধ পদ্ধতির মাধ্যমে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ সমাজগঠনে; পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক জীবন এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত সৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করে। এ সমস্তই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক শক্তিরূপে পরিগণিত।

শিক্ষাসূচী সংগঠনের সময়ে অনেক সময়েই ব্যক্তিগত ও সামাজিক পারস্পরিকতার নীতি অনুসরণ করা হয় না। স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তথাকথিত বুদ্ধিগত উন্নয়নের কাজেই এত লিপ্ত থাকে যে এই ধরনের তুচ্ছ বিষয় বিবেচনা করবার কোনো সময়ই তাদের থাকে না। সামাজিক দায়িত্ববোধ শিক্ষা দেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমাজগত বসবাসের ইউনিট[illegible]রূপে সংগঠিত করা প্রয়োজন। জলে সাঁতার দিয়েই সাঁতার দেওয়া শেখে; [illegible] সেবা করেই সেবাবৃত্তি শেখা যায়।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এই নীতিই যদি জীবন-প্রেরণা স্বরূপ না হয়, তাহলে সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টাই হবে জোড়াতালির সামিল। কারণ, এই সংগঠনের সদস্যরূপে বাস না করলে সুস্থ সমাজ সংগঠনের নৈতিক মূল্যবোধ কীভাবে জাগ্রত হবে?

সুস্থ সমাজজীবনের গুণাবলী বর্ণনা করা যেতে পারে, এর তত্ত্বগত ভিত্তিও বিশ্লেষণ করে দেওয়া সম্ভব, এর পূর্ণ ইতিহাস, সমাজজীবনের নীতিও শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সমাজের সেবা ছাড়া, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ সমাজের সদস্য না হওয়া ছাড়া কোনো ছাত্রকে এর জীবন-প্রেরণা ও শক্তিদানকারী অভিজ্ঞতা কী করে শিক্ষা দেবে? সমাজের বর্তমান শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা এবং এর ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ বৃদ্ধি কল্পে শিক্ষার্থীর মনে অতি জরুরী নৈতিক চ্যালেঞ্জ জাগ্রত করতে হলে এইরূপ সমাজের বাস্তবচিত্র বিশেষ সহায়ক হবে। ভাল পরিবারে, ভাল বিদ্যালয়ে, একই মনোভাবসম্পন্ন সমাজে মানুষ হলে শহর, রাষ্ট্র, জাতি এমনকি সমগ্র মনুষ্যজাতির সেবায় সে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

সমধর্মী মূল্যবোধ এবং সমধর্মী সংস্কৃতির বস্তুর ভিত্তিতে বিদ্যালয়-সমাজ গড়ে উঠেছে, ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুল, ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং প্যালেস্টাইনে বেশ কিছু সংখ্যক পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়-সমাজ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে অনুরূপ বহুসংখ্যক বিদ্যালয়-সমাজ গঠনের প্রস্তাবনায়। এ থেকেই বোঝা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে এবং স্বভাবতঃই বিভিন্ন মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল শিক্ষার চিন্তাধারা সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য এ ইঙ্গিত খুবই সামান্য। লক্ষ লক্ষ শিক্ষা কারখানার কলকোলাহলের মধ্যে এক দুর্বল কণ্ঠস্বর! কিন্তু এই ধারণা এমন ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করছে বলে মনে হয় যে বিদ্যালয়-সমাজে সামাজিক জীবন ধারণের বাস্তব অভিজ্ঞতাই সামাজিক দায়িত্ব পালনের এবং তার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের উপায়রূপে ব্যবহারের প্রচেষ্টা শিক্ষাদানের পক্ষে অপরিহার্য।

সকল শিক্ষার্থী শিশুর জন্য আবাসিক বিদ্যালয়-সমাজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হয়তো দুরাশা।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা না করেও বিদ্যালয়সমূহকে শিক্ষা সমাজ এবং সমলক্ষ্যের প্রতিষ্ঠানরূপে সংগঠিত করবার উপায় বের করতে পারবে মানুষের প্রতিভা। আমার মনে হয়, একনায়কতন্ত্রী দেশসমূহেই প্রথমে এবং খুব শীঘ্রই এর প্রতিষ্ঠা হবে। অন্যান্য জিনিসের মতো, এ ক্ষেত্রেও গণ-তান্ত্রিক দেশসমূহ কিছু পরে এ সম্পর্কে সচেতন হবে। অথচ গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা রক্ষার জন্য অন্যান্যদের চেয়ে তাদেরই এর প্রয়োজন বেশী।

অন্যান্যরা বলপ্রয়োগ করে সকলের সেবা আদায় করতে পারে; কিন্তু গণতন্ত্রকে অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না স্বাভাবিকভাবে সামাজিক দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হয়, যতদিন না ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সৃজনধর্মী সম্পর্কের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা সমৃদ্ধতর সমাজ গঠনের প্রেরণা লাভ করে। শিল্পো-ন্নয়নেব ফলে যেখানে পরিবার সংগঠনে দ্রুত অবনতি ঘটছে সেখানে হয়তো এলোমেলো ভাবে এ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু একমাত্র বিদ্যালয়-সমাজের মাধ্যমেই সুশৃংখলভাবে এই নীতি প্রবর্তন সম্ভব। কারণ তাকে সুস্পষ্টভাবে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে গণতন্ত্রের জীবনযাত্রার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার বিদ্যালয়সমূহে।

যে শিক্ষাপদ্ধতি আমরা প্রবর্তন করতে চাইছি তাতে এই প্রশ্নের একটা সুস্পষ্ট উত্তর প্রয়োজন। প্রশ্নটি হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব। গণতান্ত্রিক সমাজে এর গুরুত্ব আরও বেশী। কারণ প্রত্যেক গণতন্ত্রই ব্যক্তির মর্যাদা দেয়। ব্যক্তি তার কাছে লক্ষ্যস্বরূপ, উপায়স্বরূপ নয়। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মূল্য-লক্ষ্য-আগ্রহ সঙ্গীতির নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানসের উন্নয়নের শিক্ষাদান এবং সংস্কৃতির বস্তুনিচয়ের মাধ্যমে নৈতিক স্বাধীন ব্যক্তিত্বের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া।

ব্যক্তির ওপর এই ঝোঁক এবং ব্যক্তির নিজস্ব জীবন-কাঠামো অনুযায়ী তার উন্নয়নের সম্ভাবনার একমাত্র স্বীকৃতির ফলে এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গণতন্ত্রের শিক্ষাসংগঠনের সর্বত্রই শাসন কর্তৃপক্ষ বাদ দিয়ে থাকবে অবাধ স্বাধীনতা। এই ধারণা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নীতিই নয়, অনেকেই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে এই নীতি প্রচার করেছেন 'সকলের সমান উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া এবং প্রতিকূল প্রভাব দূরীকরণ' করাই উচিত। 'ওয়াখসেনলাসেন' (Wachsenlassen) বা 'বেড়ে উঠুক' এই হলো এক শিক্ষাদর্শন।

আমাদের এই পরম আশ্রয় দেশে আমরা নিজেদের সমস্যার বাইরে সুশৃংখল চিন্তাধারায় অভ্যস্ত নই। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা চিন্তা ও ধ্যান করে গেছেন এ আজ অবিস্মরণীয় সত্য। আজও কেউ কেউ আমাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। এতে আমরা সুখকর আরামের অনুভূতিই লাভ করি। মৌলিক সমস্যাবলী, বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাবলীর দ্বারা আমরা খুব বেশী চিন্তান্বিত হইনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই আলোচনার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই বলেই মনে হয়।

কিন্তু আমি পলায়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত নই। এই সমস্যাবলীর সম্মুখীন আমাদের হতেই হ'বে, শীঘ্রই হোক কি বিলম্বেই হোক। শীঘ্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেছে। এর স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারবো না। দীর্ঘকাল ধরে বুদ্ধিজীবীদের কর্তৃত্ব, বিনা-সমালোচনায় তার স্বীকৃতি, বিনা-প্রশ্নে সমচিন্তা প্রয়োগই বর্তমান শিক্ষার প্রচলিত ভাবধারা। হাতে তৈরী তথ্য সরবরাহ, 'পরীক্ষার নোট' বইগুলো যার প্রতীক, শাস্ত্রপাঠের মতোই যার প্রতি আনুগত্য, যান্ত্রিকভাবে দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা দান এবং 'বেত না মারলে ছেলে খারাপ হয়ে যায়' এই নীতির প্রতি প্রচলিত আশংকা ও বেত ব্যবহার করে শিশুকে মানুষ করা,—এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের শিক্ষাগত কার্যক্রমে এখন মূল নীতিই হ'লো স্বাধীনতা বাদ দিয়ে কর্তৃত্বের রাজত্ব।

এই চিত্রের অন্য দিকও আছে। ছাত্রদের আজকাল অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা, কী তারা করবে এবং কী তারা করবে না। শিক্ষকদের শোচনীয় বিরাগ, ঔদাসীন্য এবং আত্মতুষ্টির মনোভাব এবং ছাত্রদের মধ্যে অসংযত মানসিক আসক্তি, নৈরাশ্য এবং অমনোযোগের প্রায়ই অভিব্যক্তি হয় তাদের ব্যবহারে। গোঁয়ার গোবিন্দ তরুণ কিংবা তাদের চেয়েও গোঁয়ার তরুণতর ছাত্ররা রয়েছে একদিকে। এবং অন্যদিকে রয়েছেন নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ও হতাশায় পরাজিত শিক্ষকদল (যদি তাদের ক্ষুব্ধ তরুণদের দলভুক্ত করা না যায়)—এ সমস্তই ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের এই স্বাধীন দেশে শিক্ষার নীতি যেন 'যে ভাবে ইচ্ছা বেড়ে ওঠার' নীতি। আমরা যদি তাদের বড় করে ফুল ও ফলে শোভিত করতে না পারি, তাহলে তারা ইচ্ছামত আগাছার মত বেড়ে উঠুক।

এইরূপ বিশৃংখল পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ পদ্ধতিতে সংগঠিত করবার আশা করতে পারি না। স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব, শিক্ষার ক্ষেত্রে, আমার মতে, পরস্পর-বিরোধী নীতি নয়। কারণ অন্ত-

নিহিত স্বাধীনতার স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো শিক্ষা-পদ্ধতিতে কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। এবং নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা ব্যতীত, যাকে বলা হয় কর্তৃত্ব, কোনো স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। যদি কতৃত্ব বলতে বলপূর্বক বাধ্যতা মনে করা হয় এবং স্বাধীনতা বলতে মনে করা হয় স্বেচ্ছাচারিতা ও অসংযম, তাহলে অবশ্য এই দুইটি নীতি পরস্পরবিরোধী। কোনো সমাজেই, তা পরিবার, বিদ্যালয় কিংবা রাষ্ট্রই হোক না কেন, স্বাধীনতার যত মূল্যই থাকুক, সেখানে প্রত্যেক সদস্যই নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ না মেনে পারে না। এবং একেই বলা হয় কর্তৃত্ব।

এমন কোন স্বয়ংচালিত ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করা যায় না, যার জৈবিক সহজাত-বৃত্তি এবং কামনাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো নীতি নেই, যার সাহায্যে মানুষের মন স্বাধীনতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এইরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি না থাকলে সমাজ লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত, ব্যক্তিপুরুষ জৈবিক কামনা বাসনার দাসে পরিণত হ'ত।

শিশু বয়স থেকে যদি কোনো শিশুকে বিনা নির্দেশে নিজের নিয়ন্ত্রণেই ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেও নিজেই অনুরূপ নিয়ন্ত্রণনীতি মেনে চলতে শিখবে। মনের বিধির যে বিশ্বজনীনতা আছে তাতে এই সম্ভাবনাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না।

কিন্তু তাকে অনেক দীর্ঘ ও কঠোর পথ অতিক্রম করে এই পর্যায়ে পেঁছুতে হবে এবং তখন এই আত্মআবিষ্কারকে কাজে লাগাবার মতো যথেষ্ট সময় সে নাও পেতে পারে। ব্যক্তিমানস প্রকৃত আত্ম-নিয়ন্ত্রণের স্তরে পেঁছুবার পূর্বে বহিকর্তৃত্বের এই স্তর অতিক্রমণে সমাজ তাকে সাহায্য করে। স্বাধীনতার পথ তৈরী করে দেয় কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণ ছেঁটে বাদ দিলে এই পথকেই করা হ'বে খণ্ডিত। শিক্ষার মূল প্রশ্ন হলো আত্ম-নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত লক্ষ্যে পেঁছুতে বাইরের চালিকা শক্তি এবং কর্তৃত্ব কতখানি প্রয়োজনীয় তার নিরূপণ। কতদূর পর্যন্ত কর্তৃত্ব থাকবে, স্বাধীনতা দেওয়া হ'বে কখন—কারণ, নৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হ'লে স্বাধীনতা অবশ্য প্রয়োজন।

শিক্ষার সুরুতে আসে কর্তৃত্ব, সমাপ্তিতেও। প্রারম্ভিক কর্তৃত্ব হলো বয়সের ও অভিজ্ঞতার। স্নেহশীল, মমতাময় পরিচালনার। অবশ্য অধিকতর শক্তি থাকলে কিছুটা অবাঞ্ছিত জবরদস্তিও হতে পারে। তবে প্রত্যেক ভাল স্কুলই এ বিষয়টি যথাসম্ভব নেপথ্যে রাখবার চেষ্টা করে।

শিক্ষার সমাপ্তি পর্বে যে কর্তৃত্ব তা হলো স্বাধীন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ মূল্যবোধের এবং স্বাধীনভাবেই ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক সংস্কৃতির বস্তুর মাধ্যমে

সেগুলো স্বীকৃতি পায়। শিক্ষা কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করতে হলে প্রারম্ভেই কর্তৃত্বের স্বীকৃতি প্রয়োজন। শিক্ষা সংগঠনে কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং তার সংহতি সাধনের প্রতি দৃষ্টি থাকলে এই কাজটি কঠিন মনে হবে না।

শিক্ষার মূল্য এবং শিক্ষকরা যে মূল্যবোধের প্রতিনিধি তার প্রতি মর্যাদা দান এবং তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজটি দুরূহ বলে মনে হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে, ততক্ষণ শিক্ষার রূপায়ণ হবেনা এটা প্রত্যেকের জানা উচিত। শিক্ষকের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ এবং বিশেষ দায়িত্ব হলো তরুণদের পরিচালিত করা এবং তাদের মানসিক উন্নয়নে এভাবে সাহায্য করা যাতে তাদের মধ্যে কাজের জন্য এবং কাজের ত্রুটির জন্য দায়িত্ববোধ জন্মে; তাদের মধ্যে আত্মশিক্ষার দুর্বার প্রেরণা জাগ্রত হয়। এ ক্ষেত্রে যতখানি সাফল্য তারা অর্জন করবে তদনুপাতে স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ সুযোগ দান। কথাগুলি বলা সহজ। কিন্তু সৎ শিক্ষক সম্প্রদায়ের পক্ষে আগামী কালের এক দুরূহ কর্তব্যভার। আমি আশা ও বিশ্বাস করি সেই শিক্ষক সম্প্রদায় এগিয়ে আসবেন।

এর পূর্ববর্তী দু'টি বক্তৃতায় আমি শিক্ষার আদর্শ, ব্যক্তিমানসের চর্চার ক্ষেত্রে এর অবদান এবং সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনায় একে সম্ভাব্য পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে ছয়টি নীতি অনুসৃত হয় তার গুরুত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। আমার মতে সমস্ত শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই নীতিগুলো প্রযোজ্য এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সারবস্তু থেকেই এগুলো উৎসারিত।

কিন্তু সমস্ত শিক্ষাই সর্বসাধারণের জন্য নয়; সমস্ত শিক্ষাই রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত সমাজ দ্বারা সংগঠিত নয়, রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত নয়। এবং সমস্ত শিক্ষার ব্যয় রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক বহন করে না। 'সমস্ত শিক্ষা' শব্দটি খুবই ব্যাপক। কারণ এতে এমন অনেক শিক্ষা কার্যক্রম বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে যা হয়তো সমাজের বিশেষ কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠির জন্য নির্দিষ্ট।

মানব ইতিহাসের সমস্ত পর্যায়ে কোনো না কোনো ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। একমাত্র আদি গোষ্ঠিবদ্ধ যুগে তা ছিল না। সে সময়ে জীবনই ছিল শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত। শিক্ষার জন্য বিশেষ স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না। কিন্তু, আমার মনে হয়, শিক্ষা কখনও সর্বসাধারণের জন্য ছিল না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য, অবসরভোগী স্বল্প কয়েক জনের জন্য, বিত্তশালী শাসক শ্রেণীর জন্যই ছিল। যারা মানব ভ্রাতৃত্বের ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাদের জন্য এবং যাঁরা নিজেদের মনকে জ্ঞানভান্ডারে পরিণত করবার বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতেন তাদের জন্য। তাঁদের এই প্রচেষ্টায় বৈষয়িক সহায়তা দিত সমাজের অন্যান্যরা যাদের বিত্ত থাকত উদ্বৃত্ত।

সে যুগে সমস্যা ছিল কয়েকটি ব্যক্তি শ্রেণীকে শিক্ষাদানের সমস্যা। এবং তাদের সংখ্যা সমাজে খুব বেশী ছিল না। শাসক শ্রেণী, পেশাদার শ্রেণী কিংবা এমন শ্রেণীর মানুষ যাদের জীবনধারণের জন্য কাজ করতে হ'ত না। স্বভাবতঃই এ সমস্যা সেই শ্রেণীর মানুষরাই সমাধান করতো, গোটা সমাজ নয়।

আধুনিক রাষ্ট্রের সমস্যা হলো তার সমস্ত নাগরিককে এক জাতীয়ত্বের ভাবধারায় শিক্ষিত করে তোলা যাতে রাষ্ট্রে তারা যোগ্য স্থান গ্রহণ করতে পারে। আধুনিক যুগের আমূল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজ সংস্থা ও শিল্পজীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, জনগণের ঐক্যবোধ এবং দক্ষতা বাড়াবার জন্য নতুন সামাজিক সংস্থা গঠনের এই যে জরুরী তাগিদ তার ফলেই আজ রাষ্ট্রকে প্রত্যেকের জন্য, প্রত্যেকের সন্তানের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রত্যেক শিশুর জন্য রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দায়িত্ব গ্রহণের ইতিহাস খুব

প্রাচীন নয়। এর প্রবর্তন সর্বপ্রথম হয়, সম্ভবতঃ জার্মানীতে, প্রায় আড়াই শো বছর আগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন, কয়েকটি রাজ্যে, মাত্র ১০০ বছর আগে প্রবর্তিত হয়েছে। অন্যান্য দেশে এর ইতিহাস তো আরও পরের। আপনারা শুনে আগ্রহান্বিত হবেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে যখন বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রণীত হচ্ছিল, তখন এই আইনের বিরোধীরা কিছু কিছু লোককে একথা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের 'জন্ম প্রুশিয়ায়' শুধুই নয় এটা হলো 'স্বৈরতন্ত্রের যন্ত্রস্বরূপ'। অতএব কোনো স্বাধীন সরকারের বিধান গ্রন্থে এর স্থান হওয়া উচিত নয়।

ত্রিশের দশকের শেষ দিকে সর্বজনীন অবৈতনিক এবং আবশ্যিক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন পরিকল্পনা বিচারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তাতে একজন বিশিষ্ট শিক্ষা অধিকারিকের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথমেই আকস্মিক ও রাগত প্রশ্ন শোনা গেলঃ 'সর্বজনীন কেন এবং কেনই বা আবশ্যিক?' প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা আমি এবং আমার কয়েকজন সহকর্মী কাটিয়ে না উঠতেই তিনি যথার্থ উষ্মার সঙ্গে আমাদের ভর্ৎসনা করলেন, 'যে দেশ স্বাধীন হবার জন্য সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের সকলের জন্য এরা প্রথমেই শুরু করতে চায় জবরদস্তি দিয়ে!'

আমি তাঁকে জিনিসটা বোঝাবার জন্য অসম বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। অসম এ জন্যে যে তিনি আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন। এবং তাঁর পক্ষে অসম এ জন্যে যে তিনি এমন একটি কমিটিতে ছিলেন যাঁদের সঙ্গে তিনি একমত নন। তিনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক ও আন্তরিকভাবেই ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। কিন্তু কমিটির আলোচনার শেষ দিন পর্যন্ত তিনি স্বমতে ছিলেন অটল, এবং একক বিষণ্ণ প্রতিবাদী। তাঁর যুগের এবং তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অনেকেই সকল মানুষের সকল শিশুর জন্য শিক্ষাব্যবস্থার এই নতুন ভাবধারার সঙ্গে সহজে মনকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন না। বর্ণপরিচয় পর্যন্ত মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সকলের জন্য শিক্ষা ব্যাপারটি গভীর সন্দেহ ও প্রশ্ন না নিয়ে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, আজ আর আপনাদের সঙ্গে এ নিয়ে সুদীর্ঘ তর্ক করবার কোনো প্রয়োজন নেই। সাম্প্রতিক কালে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে, আমাদের চোখের সামনেই যেরূপ দ্রুত গতিতে ঘটছে এবং অদূর ভবিষ্যতে দ্রুততর গতিতে ঘটবে তাতে রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

জন্য নিম্নতম একটা শিক্ষা লাভের অধিকার স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই দায়িত্ব।

বিশেষতঃ আমাদের দেশের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন আমরা লোকায়ত কল্যাণ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার কাঠামো তৈরী করবার চেষ্টায় ব্রতী, এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন। কারণ, গণতান্ত্রিক সমাজে অন্যের দ্বারা নির্ধারিত ভাবধারা এবং পরিকল্পনা রূপায়ণ ও উপলব্ধিই একমাত্র কাজ নয়, প্রত্যেক নাগরিককেই জাতীয় জীবনের কাঠামো তৈরী করতে তার অংশটুকু দান করতে হয়।

গণতন্ত্রকে নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর, উপরতলা থেকে নির্দেশের ওপর নয়। এর শৃংখলা আত্ম-শৃংখলা, চাপিয়ে দেওয়া শৃংখলা নয়। সহযোগিতা, অনুনয় এবং সুশৃংখল কর্মোদ্যম নির্ভর করে পারস্পরিক বোঝা-বুঝি, উদার সহিষ্ণুতার ওপর। এগুলোই গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান। গণতন্ত্রের অন্যতম দুরূহ দায়িত্ব হলো প্রত্যেক নাগরিককে জাতীয় নীতিবোধ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষা দান।

এই সমস্যাটি কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ, তার সংবিধানের মৌলিক নীতি এবং বিশিষ্ট জীবনযাত্রার জন্যই এড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ, এই মৌলিক নীতি গ্রহণের জন্যই এমন কেন্দ্রাতিগ শক্তির সৃষ্টি হয় যা সহজেই অবিন্যস্ত হয়ে সমাজ-সংস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিজের কাঠামো ঐক্যবদ্ধ রাখতে কিছু করতে হয়। এর সবচেয়ে কার্যকর পন্থাই হলো শিক্ষা। তবে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অদূরদর্শীও হতে পারে, দূরদর্শীও হতে পারে। অব্যবহিত জিনিস নিয়ে এ ব্যস্ত থাকতে পারে, অথবা চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কেও এ মনোযোগী থাকতে পারে। নৈতিক স্বাধীনতার উন্নয়নও রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে, কিংবা তার ধ্বংসসাধন।

যদি গণশিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে সর্বশক্তিমান, সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র নির্দিষ্ট বয়সের সকল নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং বিদ্যালয় গমন নির্দেশের দ্বারা যেমনভাবে জীবনযাত্রাও করে দেয় নির্ধারিত, তাহলে এ ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দ্বারা আমরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই লাভ করতে পারবো না। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা একতরফা কোনো প্রাণবন্ত নৈতিক ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সে শিক্ষাব্যবস্থা যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন।

যদি রাষ্ট্র যথার্থ অধিকারেই নিজেকে পরিপূর্ণ নৈতিক রাষ্ট্রের বিবর্তনের ধাপ বলে মনে করে যার অবিরাম প্রচেষ্টাই হলো নাগরিকদের স্বাধীন নৈতিক

ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পথ তৈরী করা, তাহলে রাষ্ট্রকে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নির্ধারিত করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতেই হবে। কারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সক্রিয় স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার মাধ্যমেই রাষ্ট্র সত্যিকারের সংবিধান-সম্মত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

যে রাষ্ট্র নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করে সেটি নিজেই সর্বোত্তম নৈতিক সত্তা। কারণ এরূপ অবস্থাতেই ব্যক্তিগত নাগরিকরা সম্পূর্ণ স্বাধীন নৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্জনের প্রেরণা লাভ করতে সক্ষম হয়। নাগরিক ও রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক হয়। রাষ্ট্রকে তার নৈতিক আদর্শ উপলব্ধির সহায়তা করতে গিয়ে নাগরিক নিজেও তাঁর পরিপূর্ণতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ গ্রহণ করে। আমি জানি রাষ্ট্রের ভাবাদর্শের সমস্ত অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি সত্য নয়। স্বাধীন নৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্জনের লক্ষ্যে পেঁাছুতে কতকগুলি শক্তিশালী প্রতিবন্ধকও রয়েছে।

রাষ্ট্র তখন চরম অকল্যাণের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায়। অনেক মনীষীই এ ধরনের আশংকা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করে তারা একদিন নিরপেক্ষ, হিতব্রতী, ন্যায়ধর্মী রাষ্ট্রের আদর্শকে সার্থক করে তুলতে পারবে। কোনো ব্যক্তিকে প্রকৃত নাগরিক হতে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তার রাষ্ট্রকে নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রে রূপায়িত করবার সহায়করূপে গড়ে তোলা।

এমন শিক্ষার কোনো অর্থ নেই যাতে নাগরিকরা এমন অভ্যাস ও চিন্তাধারায়, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অভ্যস্ত হবে যার ফলে রাষ্ট্রের আদর্শ উপলব্ধির বিবর্তন-মূলক ধারায় উপেক্ষা বা প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। সংবিধানের ভাল উপকরণগুলো গ্রহণ করবে অথচ চরম অকল্যাণের বিষণ্ণ অন্ধকারের ভয়াবহতা যাবে রেখে যাতে কোনো ভাল জিনিসেরই সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।

নৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনোযোগী কোনো একটি ভাল রাষ্ট্রের সামনে দুই ধরনের লক্ষ্য থাকে; রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের শান্তি ও নিরাপত্তার অহং-কেন্দ্রিক লক্ষ্য, নিজের সত্তা বজায় রাখবার জন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং তার নাগরিকদের শারীরিক ও নৈতিক কল্যাণ বিধান; এবং একটি মানব বিশ্ব অথবা মানবজাতির ফেডারেশন গঠনের প্রচেষ্টায় সমধর্মী জনগণের সহযোগিতা লাভের জন্য নিজেকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করে সক্রিয় মাধ্যমরূপে গড়ে তোলা। যদি এরূপ কোনো ভাল রাষ্ট্র তার সমস্ত নাগরিকদের সমস্ত সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে এ আশা ন্যায়সঙ্গতভাবেই করা যায় যে শিশুদের এমন-

ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বাভাবিক ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুযায়ী সহায়তা করতে পারবে। রাষ্ট্র কেন সমস্ত বালক ও বালিকার শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সমস্ত বালক ও বালিকা শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তাও কেন উপলব্ধি করবে? রাষ্ট্র শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন ভাল ও উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তুলবে যারা এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে। হিতবাদী এবং নীতিবাদী উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যই এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রের এই দ্বিবিধ লক্ষ্যের কথা স্মরণ রেখে একথা বলা যায় যে বাধ্যতামূলক পাব্লিক স্কুলের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য থাকবেঃ প্রথম উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের কোনো প্রয়োজনীয় কাজের উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়া, তার ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজের কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উপযোগী করে তোলা। প্রথম উদ্দেশ্য থাকবে বৃত্তি-শিক্ষা দান অথবা শিক্ষালাভের বাধ্যতামূলক নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে যতদূর সম্ভব বৃত্তিশিক্ষার প্রস্তুতি সমাপ্ত করে দেওয়া। এ হলো হিতবাদী উদ্দেশ্য। কিন্তু বিদ্যালয়ের নৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজের এটাই হলো ভিত্তিস্বরূপ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো বৃত্তিশিক্ষাকে নৈতিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করা এবং শিক্ষার্থীকে যতটা সম্ভব সুস্পষ্টভাবে একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে বৃত্তি শুধুমাত্র জীবিকার্জনের একটি উৎস-মাত্রই নয়, এটা হলো সুসংগঠিত সমবায়িক সমাজে জনসাধারণের সেবাকার্যের দায়িত্ব। সমাজব্যবস্থার নৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একে নিযুক্ত করতে হবে।

বাধ্যতামূলক পাব্লিক স্কুলের তৃতীয় লক্ষ্য হবে সমাজের সদস্যদের মধ্যে নিজেদের নৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলবার দীর্ঘ ও রোমাঞ্চকর পথযাত্রা শুরু করবার প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করা এবং তাকে সমাজের নৈতিক পরিপূর্ণতার কাজে নিয়োগ করা। এতে সে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে নৈতিক দিক দিয়ে নিখুঁত সমাজ কেবলমাত্র নৈতিক দিক দিয়ে মুক্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ কর্ম-সাধনার দ্বারাই নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

এই তিনটি লক্ষ্যে উপনীত হতে আমাদের যে ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তা নিয়েই সোজাসুজি আলোচনা করা যাক। ছাত্রদের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সেই প্রাথমিক দায়িত্ব কি ভাবে স্কুল পালন করতে পারে। সমাজ যদি পেস্টালোজির সময়ে সুইজারল্যান্ডের মতো সহজ-ভাবে সংগঠিত হত কিংবা গান্ধীজী একান্তভাবে যে গ্রামীণ সমাজের কথা চিন্তা

করতেন সে রকম হ'ত তাহলে বিদ্যালয় তার ছাত্রদের জীবিকার জন্য অনেক দূর তৈরী করে দিতে পারত। দেশে শিল্পায়নের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। এই জটিলতায় আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই।

কোনো স্কুলই, সাত কি আট বছরের মধ্যে, ছাত্রদের জীবনে জীবিকার উপযোগী সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারে না। সেজন্য স্কুলগুলো তাদের ছাত্রদের মানসিক ও কায়িক কার্যক্রমের এমন প্রস্তুতি দিয়ে দেবে যাতে তারা সমাজজীবনে দক্ষতার সঙ্গে এবং সুষ্ঠুভাবে স্থান পূর্ণ করতে পারে। এই সমস্ত বিদ্যালয় থেকে প্রথম যে ছাত্রদল বেরিয়ে যাবে তাদের প্রধানত কায়িক কার্যক্রম দিয়ে সমাজে স্থান করে নিতে হবে।

পুঁথিগত শিক্ষার যে বিদ্যালয় এখন রয়েছে, সেগুলো আমাদের অধিকাংশ ছেলে ও মেয়েদের জীবনে জীবিকার সংস্থান করে দিতে পারবে না। এমন বিদ্যালয় তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে প্রধান শিক্ষাকার্যক্রমই হবে কায়িক শ্রম। যারা অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর পেশা গ্রহণ করবে তাদের জন্য ভিন্নতর বিদ্যালয় থাকতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা যদি এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিশ্বাস পোষণ করেন যে তাঁদের সন্ততিরাও বুদ্ধিজীবীই হবে তাহলে বিরাট সংখ্যক সক্রিয় কর্মানুরাগী শিশুদের মধ্য থেকে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিশুদের বেছে বের করার পদ্ধতি সহজ নয়।

তাই আমরা যে ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাই সেগুলো হবে মানসিক ও কায়িক কার্যক্রমের স্কুল। যতদিন পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপায়ে সেই বয়সের পুঁথিগত বুদ্ধিজীবীদের পৃথক করে বাছাই করা না যায়, ততদিন পর্যন্ত কায়িক কার্যক্রমই হবে শিক্ষাগত কর্মসূচীর কেন্দ্রস্বরূপ। আশা করি আমার দ্বিতীয় বক্তৃতাতেই এ বিষয়টি আমি সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পেরেছি যে মানসিক কাজই হলো শিক্ষামূলক কায়িক কার্যক্রমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কায়িক কার্যক্রমের এই স্কুল, সেহেতু কায়িক ও বুদ্ধিজীবী উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষেই জীবিকাগত শিক্ষালাভের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হবে।

যথাযথভাবে সংগঠিত করতে পারলে এই ধরনের স্কুল গ্রামীণ ও শহরের অধিবাসী, কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী এবং কায়িক ও বুদ্ধিজীবী উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট কার্যকরী হবে। এর ফলে ছাত্ররা কাজে অভ্যস্ত হবে, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমস্যা-পূরক কার্যক্রমের মাধ্যমে যৌক্তিক চিন্তা পদ্ধতি আয়ত্ত করবে। নিজেদের কাজ করবার সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে সযত্নে চিন্তা করবে, যথাসম্ভব যত্নে

দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করবে, নিজেদের খেয়ালখুশির চেয়ে বাস্তব যুক্তি অনুসরণ করবে। ছাত্ররা আরও শিখবে পরিপূর্ণতা লাভের আনন্দ এবং আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতর সাফল্য লাভের উপায়।

এর চেয়ে দীর্ঘকাল স্কুলে পড়ে আমাদের অনেকেই যা শিখতে পারিনি, প্রস্তাবিত কাজের স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েরা তার চেয়ে অনেক বেশি শিখতে পারবে। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে যথাযথভাবে সংগঠিত কাজের স্কুলই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল এনে দেবে। এখন পর্যন্ত যে কয়টি কাজের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোতে যদি আশানুরূপ ফল লাভ না হয়ে থাকে, তার কারণ আমাদের যুগের ছাত্রদের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়নি।

গণশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হবে শিক্ষামূলক কাজকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণের মাধ্যমে। দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো শিক্ষাকে নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং নৈতিক শিক্ষায় রূপান্তরিতকরণ। ছাত্রদের এটা উপলব্ধি করতে হবে যে তাদের বৃত্তিগ্রহণ শুধুমাত্র জীবিকার্জনের পন্থাই নয়, শ্রম বিভাগের ভিত্তিতে সমবায়িক সমাজে এ হলো প্রকৃত জনসেবা। আমি মনে করি আমাদের বিদ্যালয়-সমূহকে কর্ম-জীবন সমষ্টিরূপে সংগঠনের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে।

এই সমাজ হবে সদস্যদের বয়ঃক্রমের উপযোগী নৈতিক আদর্শের প্রতীক-স্বরূপ। কর্মভিত্তিক এই গোষ্ঠী মহৎ-মনা বন্ধুত্বের প্রতিভূ হতে পারে। অজানাকে জানবার, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক সত্যকে আবিষ্কার করবার এই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা। সৌন্দর্য সৃষ্টি ও উপলব্ধি, সুস্থ জীবনের মান প্রতিষ্ঠা, অসহায়কে সহায়তাদান, নির্ভীকভাবে নিজের মনের বক্তব্য প্রকাশ করা, কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করা, স্কুল-সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করবার সদা প্রস্তুতি, স্কুলের টীমের জন্য খেলা এবং আরও বহুবিধ আদর্শের মাধ্যমেই এই সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এই সমাজে কাজ হলো সেবার নামান্তর এবং এর দ্বারাই গড়ে ওঠে চরিত্র।

কর্ম সমষ্টির ব্যস্ত পরিবেশে বহুবিধ ফলপ্রদ সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে সামাজিক মর্মবোধ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি গড়ে ওঠে যা তার চরিত্র গঠনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এখানেই দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠবার অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্র পাওয়া যায়।

যে শিশুরা এই পরিবেশে কাজের মধ্য দিয়ে অবর্ণনীয় আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করেছে তারা পরবর্তী জীবনেও এর জন্য আগ্রহান্বিত থাকবে এবং কাজের মধ্যে

তার সন্ধান লাভ করবে। বিশ্বের সর্বত্র এই ধরনের বিদ্যালয়-সমাজ গড়ে তোলবার জন্য পরীক্ষা হচ্ছে। শিক্ষাকে যদি আমরা গুরুত্ব দিই, তাহলে আমাদেরও তা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যয়বহুল পাবলিক স্কুলসমূহের জন্য এ পরীক্ষা করলেই চলবে না, সর্বসাধারণের শিশুদের জন্য আমাদের স্কুলগুলোতে এই পরীক্ষা করবার উপায় বের করতে হবে। বাধ্যতামূলক ভারতীয় স্কুল-গুলোকে প্রকৃত কর্মসমষ্টিতে রূপান্তরিত করবার জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ-দের মনোনিবেশ করতে হবে।

তৃতীয় লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীর আত্মশিক্ষার ধারা প্রবর্তন। ছাত্রদের মনে এমন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা যাতে সে সমাজকে নৈতিক দিকে শ্রেষ্ঠতর করবার জন্য নিজে নৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন ব্যক্তিরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। বাধ্যতা-মূলক বিদ্যালয়েই শিশুর মনের বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী এই আত্মশিক্ষার ধারা প্রবর্তনের সূত্রপাত করা যেতে পারে। ১৪ বৎসরের আগে যদি ছাত্রকে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে দেওয়া হয় তাহলে এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের কোনো চেষ্টারই সুযোগ স্কুল পাবে না।

এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও তার কার্যক্রম রূপায়ণের প্রধান সাংগঠনিক প্রশ্ন হলো দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে কাদের এ জন্যে নির্বাচন করা হবে?

যদি আমরা এই তিনটি উদ্দেশ্যের কথাই ধরি, তাহলে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত সর্বনিম্ন বয়ঃগোষ্ঠীর শিশুদের এ জন্য নির্বাচন করা যায় না। এই বয়সের শিশুদের কাজ হলো খেলা এবং খেলাতেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি। এই তিনটি উদ্দেশ্যের কোনোটিই এর দ্বারা সাধিত হতে পারে না।

তবে কি আমরা ২১ বৎসরের প্রাপ্তবয়স্কদের নির্বাচন করবো কিছুকালের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে? প্রথমে প্রস্তাবটা যত হাস্যকর মনে হবে আসলে বিষয়টিকে ততটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজন এর প্রতিবন্ধক হতে পারে। কিন্তু বিচক্ষণ শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় কাজের একটি প্রতিষ্ঠান, যেমন ধরা যেতে পারে শ্রমশিবির, গড়ে তুললে আমাদের প্রভূত উপকার হবে। অন্ততঃ জনসাধারণ বুঝতে পারবে যে যে বিষয় নিয়ে তারা অনবরত আলোচনা করছে তার বাস্তব রূপটি কী। পৃথিবীর বহু দেশেই এই ধরনের শ্রম অথবা সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এর দ্বারা স্কুলজীবন থেকেই বুদ্ধিমান নাগরিকত্ব এবং সুশৃংখল জাতীয় জীবনের শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশবাসীর আয়ুর গড়পড়তা এত কম যে, অপরিহার্য

প্রয়োজনীয় এই শিক্ষা ব্যবস্থা যদি খুব দেরীতে শুরু করি তাহলে জনসাধারণ একে কাজে লাগাবার যথেষ্ট সময় নাও পেতে পারে।

অতএব আমাদের বিবেচনা করতে হবে দুটি নিম্নতর বয়ঃগোষ্ঠীর কথা— ১৪ থেকে ২১ এবং ৭ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত। এই দুইটি বয়ঃগোষ্ঠিতেই জনসমষ্টির বয়সোচিত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। ১৪—২১ পর্যন্ত বয়ঃসীমাতেই আমাদের উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে এটি আরও কার্যকর হতে পারে।

কিন্তু এর তিনটি গুরুতর ত্রুটি থাকবে। প্রথমতঃ এতে সমাজের কতকগুলো সদস্যকে কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে যারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে হয়তো খুবই প্রয়োজনীয়। এতে হয়তো নববিবাহিতা পত্নী ও শিশুর অসুবিধা হতে পারে। এবং শিক্ষার দিক দিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হবে এই যে, এত দেরীতে শিক্ষা শুরু হলে শৈশবের বাস্তব কর্মপ্রেরণার সুযোগ তারা পাবে না। বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য বহু-কেন্দ্রিক কাজের মাধ্যমে যে বৈচিত্র্যময় আগ্রহ প্রতিফলিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই অতিরিক্ত জটিলতা তারা সহজে গ্রহণ করতে পারবে না।

৭—১৪ বৎসর সময়টিই সাময়িকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে একথা বলা চলে যে এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক ১৪ বৎসর পর্যন্ত দিতেই হবে। যদি কেউ কেউ এমন কথা বলেন যে জীবনের প্রথম বৎসরগুলিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে তাদেরও সন্তুষ্ট রাখতে হবে। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব, একেবারে জন্ম থেকে হলেও আপত্তি নেই, এবং ছয় বৎসর বয়স থেকে তো বটেই। যদি জন্ম থেকেই শিক্ষার সূত্রপাত করতে হয় তাহলে ন্যূনতম ১৪ বৎসরের শিক্ষা কার্যক্রম তৈরী করতে হবে। যদি ৬ বৎসর বয়স থেকে শুরু করা হয় তাহলে ৮ বৎসরের শিক্ষা কার্যক্রমেই জাতীয় সম্মতি আছে বলে মনে হয়।

আমার মতে বেশি শিশু বয়স থেকে আরম্ভ করা অপেক্ষা একটু বেশি বয়স পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালানোই অধিক প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে আমি সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করি যে, ৮ বৎসরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে ৭ থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত যে আট বৎসর তাতে ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত সময় থেকে বেশি ভাল ফল লাভ করা যাবে। কিন্তু যে বয়স থেকেই শুরু করা যাক না কেন ১৪ বৎসরের আগে যদি শিক্ষা কার্যক্রম শেষ হয় তাহলে স্বাধীন সমাজে আবশ্যিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

ভারতীয় সংবিধানেই নির্দেশ দেওয়া আছে যে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক বালক বালিকাকে সংবিধান প্রবর্তনের দশ বৎসরের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষা দিতে হবে। এই নির্দেশে দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতার সঙ্গেই শিক্ষা আরম্ভের বয়সটি উল্লেখ করেনি। তবে কত বয়স পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। আমরা এই নির্দেশ পালনের কাছাকাছিও পৌঁছুতে পারিনি। দূর ভবিষ্যতে যে এই নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে পালিত হবে তারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বলা হয়ে থাকে যে এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। আমি এ নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে চাই না। কিন্তু আমি এর সঙ্গে একমত নই।

সংবিধানে যার নির্দেশ নেই এমন বহু জিনিসের জন্য অর্থ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে।

গণতন্ত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে জনগণের ইচ্ছানুযায়ীই তা গ্রহণ করতে হয়। সংবিধানই জনমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। অতএব সংবিধান নির্দেশিত জিনিস পালনে অক্ষমতা প্রদর্শন করে অন্য জিনিসের জন্য জনগণের অর্থব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ বস্তুতঃই গুরুতর চিন্তার বিষয়। আমি এ নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাই না। তবুও ধরে নিলাম যে ৬—১৪ কিংবা ৭—১৪ বৎসর পর্যন্ত এই পুরো বয়ঃসীমার জন্য বিবিধ কারণে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব নয়। কিন্তু এ জন্যে এই বয়ঃসীমাকে ৯—১৪ বৎসর না করে কেন যে ৬—১১ বৎসর করা হলো তা আমার ধারণার অতীত।

অন্যান্য যে সমস্ত দেশ শিক্ষাকে অপরিহার্য গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে সে দেশগুলোতে আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের বয়স কী? সে দেশগুলোতে ১৪ বৎসর আগে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কখনোই শেষ হয় না। এই বয়ঃসীমা বাড়াবার দিকেই বরং প্রবণতা। কোনো কোনো দেশে বয়ঃসীমা বাড়িয়ে ১৫, ১৬ এবং এমন কি ১৮ বৎসর পর্যন্ত করা হয়েছে। অনেক দেশে দেরীতে পড়া আরম্ভ হয়, অধিকাংশই ৭ বছরে, কোনো কোনো দেশে ৮ এবং এমন কি ৯ বৎসর বয়সেও। ওপর দিক থেকে বয়স কমিয়ে দেওয়া কিংবা আরও অল্প বয়স থেকে শুরু করবার জন্য এই তাগিদ যান্ত্রিক মনোভঙ্গীরই পরিচায়ক। আবশ্যিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঔদাসীন্যই এ ধরনের বয়স পরিবর্তনের দাবীর জন্য দায়ী। যদি কেবল পাঁচ বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার অর্থ থাকে, তাহলে আমার সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে ৯ থেকে ১৪ বৎসরই এই পাঁচ বৎসর হওয়া উচিত।

আমরা বুনিয়াদী বিদ্যালয় নামে যে সমস্ত কাজের স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছি সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। আমার বক্তব্য অবশ্য বাস্তব অনুসন্ধানের ফল নয়। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে আমার মনে যে ধারনা সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তিতেই আমি এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করবো। সারা ভারত সম্পর্কেও আমার বক্তব্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য কী সে সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা রয়েছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি। এর থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে যথাযথভাবে সংগঠিত কাজের স্কুলের যা লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোতে সে লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি।

সাংগঠনিক দিক দিয়েও এর অনেক কারণ আছে। কিছু শিক্ষার দিক দিয়েও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সেটি হলো এই যে আমরা কাজের আত্যন্তিক শিক্ষামূলক শর্তটি মনে রাখিনি। এ সম্পর্কে এর আগের বক্তৃতায় আমি বলতে চেষ্টা করেছি। আমরা যেমন তথাকথিত বুদ্ধিগত পুঁথি বিদ্যালয়কে যান্ত্রিক স্মৃতিশিক্ষা স্কুলে রূপান্তরিত করতে পারি এবং তাদের সংখ্যা বিনা প্রতিবাদে বেড়েই চলেছে, তেমনি, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, আমাদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোকেও যান্ত্রিক কাজের বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেছি। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে কাজ বাইরে থেকে বিচার করে সকলের জন্য সমানভাবে নির্ধারিত করা হয়। শিশুর মনে স্বতঃস্ফূর্ত কোনো ইচ্ছার চিহ্নও দেখা যায় না। কাজের পেছনে যে ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক উদ্দেশ্য আছে সে সম্পর্কে শিশু সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কাজে তার কোনো উৎসাহ থাকে না, হয়তো নিজের হাতে কাজ করবার কৌতূহল থাকে। তাকে যেমন বলা হয় তেমনি সে কাজ করে যায়। কোনো সমস্যার তাকে সমাধান করতে হয় না। কোনো সমস্যা নেই বলেই, তাকে কোনো সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তাও করতে হয় না। সমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাব্য বিকল্প উপায়ও তাকে বের করতে হয় না। একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাকে কাজ করতে দেওয়া হয়। শিক্ষকের সঙ্গে একযোগে পদ্ধতি আবিষ্কারের সীমায়িত আনন্দটুকু থেকেও সে থাকে বঞ্চিত। মাঝে মাঝে তাকে কাজ করতে দেওয়া হয়, নিয়মিত ভাবে নয়। তাই যে কোনো ফল পেলেই, যাঁরা তাকে কাজ করান, তাঁরা সন্তুষ্ট হন।

অনিয়মিত কাজের বৈশিষ্ট্যই এই। আমি একথাও বলেছি যে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো আন্তরিক কাজে তার রূপায়ণ এবং যার থেকে সম্ভাব্য ভাল ফল লাভ তার শ্রেষ্ঠতর পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত প্রচেষ্টা করা। অথচ কাজের বেলায় দেখা

যায় যে ইন্সপেক্টর কিংবা কোনো মান্যগণ্য ব্যক্তি যখন বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান তখনই শিক্ষকরা কাজের ফলের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন। শিক্ষকরাও পরিদর্শকদের শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন। তাঁরা জানেন কারা বুনিয়াদী শিক্ষাকে মনে করেন খেয়াল এবং কারা এটিকে কিঞ্চিৎ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন। কোনো কর্মপ্রচেষ্টা তারা পরিদর্শককে দেখান না। একটি সভার আয়োজন হয়। সেখানে পরিদর্শককে মাল্যভূষিত করে স্বাগত সঙ্গীত গাওয়া হয়। তার পরে পাঠ করা হয় রিপোর্ট, পরিদর্শকের ভাষণ এবং চা পানে আপ্যায়ন।

বুনিয়াদী শিক্ষাওয়ালাকে অবশ্য কিছু কাজ দেখাতে হয় এবং তা যথা নিয়মেই দেখানো হয়। দেখা যাবে 'তকলী' এবং 'চরখা'। মোটা সুতো তকলীতে থাকে জড়ানো। যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন বার বার চরখা চালাতে গিয়ে সুতো যাবে ছিঁড়ে। কয়েকটি ছেলে এবং শিক্ষক হয়তো চরখায় ভাল সুতো বুনতে জানেন। কিন্তু ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অনিয়মিত কাজের ফল এরকমই হয়ে থাকে।

শিক্ষক যদি মনে করে থাকেন যে পরিদর্শক বর্তমান কাজের ফলের সন্দেহ-জনক উৎকর্ষ থেকে অতীতের কাজের সংখ্যা দিয়েই বেশী অভিভূত হবেন, কয়েকজন বুদ্ধিমান শিক্ষক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বারংবার পরিদর্শন দেখে এ সম্পর্কে বিশেষ আত্মজ্ঞান গড়ে তোলেন, তাহলে তিনি পরিদর্শককে দেখাবেন কোণের টেবিলে ময়লা বিদেশী মিহি কাপড়ে ঢাকা বেশ বড় আকারের স্তূপীকৃত কাপড়। পরিদর্শক যদি কৌতূহলী হন কিংবা যদি বিচক্ষণ আগ্রহ প্রকাশে উৎসুক হন এবং তাঁর যদি নোংরা-বাতিক না থাকে তাহলে তিনি সেই স্তূপীকৃত কাপড়ের ঢাকনাটি তুলবেন। তুলে তিনি দেখতে পাবেন এককালে তুলো বলে কথিত কতকগুলো ধুলো-ঢাকা পরস্পরবিচ্ছিন্ন অতি আয়াসসাধ্য বিকৃত সুতী-বস্ত্রের নমুনা। এগুলোকে শুভ্র সুতীবস্ত্রের আকারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অতি দুষ্কর কার্য বলেই প্রতিভাত হবে। শিক্ষকদের নির্দেশে কাজ করতে গিয়ে বালক-বালিকারা উদ্দেশ্যহীন কর্মতৎপরতায় এই সুতীবস্ত্রের শুভ্রতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। যদি এত সব চেষ্টার পরেও এই সুতো-গুলো দিয়ে নিরা-ভরণ দেহ আচ্ছাদন করা যেত তাহলে শিশুদের কাজের একটা অর্থ হতো। কিন্তু যেভাবে কাজ করানো হলো তাতে কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

যে কাজ যান্ত্রিক ধরনের, কোনো মানসিক বুদ্ধি প্রযুক্ত হয় না, যে কাজের যে কোনো ফলেই কেউ সন্তুষ্ট হয় এবং তার পরিপূর্ণতা আনয়নের অবিরাম চেষ্টা যেখানে নেই, যে কাজে কোনো আত্মসমালোচনা নেই এবং প্রকৃত অগ্রগতিও নেই, সে কাজকে কোনো দিক দিয়েই শিক্ষামূলক বলা যেতে পারে না। যে স্কুলে

এ ধরনের কাজ হয় সেগুলোকে কাজের স্কুল বলা যেতে পারে না।

অন্যান্য সাংগঠনিক অসুবিধাও রয়েছে। আমি দুটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করবো। অনেক সময়েই মনে করা হয় যে ভারতের শিক্ষা পরিবেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোর অনধিকার প্রবেশ অবাঞ্ছিত। বুনিয়াদী স্কুল থেকে পাশ করে বালক-বালিকারা উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায় না। সে জন্য তাদের সুবিধার্থে বুনিয়াদীর পরবর্তী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, অবশ্য তার সংখ্যা কম। সরকার প্রতিষ্ঠিত বুনিয়াদী-পরবর্তী বিদ্যালয়ে ১২ বৎসর পাঠ শেষ করেও কোনো ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বয়ংচালিত প্রতিষ্ঠান। সরকার তো বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রভর্তির নির্দেশ দিতে পারে না।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের অত্যন্ত পক্ষপাতী। কিন্তু মধ্য-শিক্ষা পর্ষৎ এবং ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা পর্ষতের ছাপমারা হাজার হাজার ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থান দিচ্ছে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল লোকেরাই বলেন বিশ্ববিদ্যালয় এখন যে শিক্ষা দিচ্ছে তাদের মান সে শিক্ষার উপযোগী নয়। তৎসত্ত্বেও নিরীহভাবে তারা তাদের গ্রহণ করে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান। অথচ বুনিয়াদী-পরবর্তী বিদ্যালয়ের ছাত্র এক কিংবা দুই বৎসরের বেশী সময় স্কুলে পাঠ করে এসেও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এটা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে সংহতি বোধের শোচনীয় অভাবেরই পরিচায়ক। শীঘ্রই এ সম্পর্কে কিছু করা প্রয়োজন।

অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে অনেক বুনিয়াদী স্কুলই শিক্ষার উৎকৃষ্টতর স্থানরূপে বিবেচিত। তার কারণ, পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে তাদের (শিশুদের) সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। সমমূল্যবোধের ভিত্তিতে তারা ক্ষুদ্র শিক্ষা সম্প্রদায় গড়ে তুলতে প্রয়াসী। নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও, এই হাতেকলমে কাজ বিশেষ বয়স-গোষ্ঠির শিশুদের মানসিক বৈশিষ্ট্যের নিকটতর। এবং সে জন্যই বিদ্যালয়গুলো কিছু সার্থক গুণাবলী উন্নয়নে সমর্থ হয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমরা এই বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিণত করতে না পারছি ততদিন আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হলে চাই দৃঢ় সিদ্ধান্ত এবং অভ্রান্ত ইচ্ছাশক্তি। এ ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষাকে শিক্ষামূলক কার্যের সমগোত্রীয় করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি নীতি থাকা উচিত, কাজের স্কুলের পক্ষেও এই নীতি খুবই উপযোগী—চিন্তা এবং কর্ম, কর্ম এবং চিন্তা। গান্ধীজীর

মতো ব্যক্তির প্রেরণায় ভারতীয় শিক্ষার ভাবধারার ক্ষেত্রে প্রায় দুই দশক ধরে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ প্রবর্তিত হলেও জনশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সরকারী ক্ষেত্রে, যারা এই নীতির নিয়ামক এবং যারা একে কার্যে রূপায়িত করবেন, তাঁদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ধরনের কাজের স্কুলের প্রকৃত সার্থকতা সম্পর্কে ঘরোয়া আলোচনায় সন্দেহ প্রকাশ করে থাকবেন, এটা বাস্তবিকই খুব দুঃখের। বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতিকে যদি মন্থর না করতে হয় এবং একে যদি নিষ্ক্রিয় না করতে চাই তাহলে এ ধরনের ধারণা দূর করবার জন্য আমাদের কিছু করা প্রয়োজন।

যদি এ ধারণাই হয়ে থাকে যে এ ধরনের স্কুলে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, এবং এই পরিকল্পনা দৃঢ়ভিত্তিক কিংবা এই পরিকল্পনার কার্যরূপায়ণ সম্ভব নয় তাহলে সে কথাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে এটা বাতিল করে দেওয়া উচিত। সে ব্যবস্থা অনেক ভাল। আমি নিশ্চিত, তা যদি করা হয় তাহলে কাজের স্কুলকে ভারতীয় শিক্ষায় পুনরায় রূপান্তরিত করা হবে এবং নতুন উদ্যমে সেই কার্যক্রমকে সার্থক করবার চেষ্টা হবে।

বহুবিধ মানসিক রক্ষণশীলতা নিয়ে কাজের স্কুলের ভাবধারাকে গ্রহণ করা এবং চিন্তাবৃত্তিহীন অকর্মণ্য প্রচারকদের দ্বারা একে বিকৃত করা আরও বিপজ্জনক।

আমার মতে বুনিয়াদী শিক্ষার ন্যূনতম সময়-সীমা হওয়া উচিত সাত অথবা আট বৎসর। যদি একে আরও কমাতে হয় তাহলে নীচের দিক থেকেই যেন কমানো হয়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে আবশ্যিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণেও পূর্ণ করতে হলেও ১৪ বৎসরই হবে তার ন্যূনতম বয়ঃসীমা। আরও জরুরী বিষয় আছে। অন্যান্য যে সমস্ত দেশ গুরুত্বের সঙ্গে আবশ্যিক শিক্ষাপদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে তারা এ বিষয়ে সচেতন যে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ৮ বৎসর কালের শিক্ষা কার্যক্রম তরুণ নাগরিকদের বৃত্তিগ্রহণ ও নাগরিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজ থেকে তাকে সরিয়ে না দিয়ে শিক্ষাকাল আরও বাড়ানোই উচিত।

এ সমস্ত দেশে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে শিক্ষানবিশীর কাজ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তরুণ জীবিকার্জনকারীদের শিক্ষাদানের দায়িত্বও যে সমাজের তার সুস্পষ্ট উপলব্ধিরও অভাব দেখা যাচ্ছে। তরুণ জীবিকার্জনকারীদের সীমাবদ্ধ শিক্ষার ফলে সক্রিয় নাগরিকত্বের প্রস্তুতি থাকে অপূর্ণ এবং বয়ঃসন্ধির সময়েই তারা জীবনের আবর্তে গিয়ে প্রবেশ করে। প্রায় ত্রিশটি দেশ কোনো না কোনো ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত রাখে। আমার কাছে সর্বাধুনিক হিসেব নেই।

এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কিন্তু ভারত তাদের অন্যতম নয়। জার্মাণরা বেশ দীর্ঘকাল ধরেই এর প্রচলন করেছে। মিউনিকে জর্জ কার্শেন্‌স্টেনারের প্রচেষ্টার ফলে তাদের ফোর্টবিল্ডুংশুলেন (Fortbildungschulen) অথবা বেরুফশুলেন (Berufschulen) প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইয়োরোপের বহু দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাজ্য তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল। গোড়াতে কল-কারখানায় এবং শিল্পবাণিজ্যে কর্মনিযুক্ত তরুণদের জন্যই এই শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরে কৃষি, খনি এবং অন্যান্য গৃহকর্মে নিযুক্তদের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। সাধারণতঃ এগুলো ছিল সান্ধ্য ক্লাশ। এখন প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা দিবা কালের জন্যও জোর দেওয়া হচ্ছে। ক্লাশে যে সময়টা থাকবে সেটা কাজের সময় বলেই ধরা হবে।

ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক কিছু করণীয় আছে। কিন্তু প্রথম জিনিসই প্রথমে করা উচিত। কোনো কোনো শিক্ষা সকল শিশুদের জন্যই। রাষ্ট্রকে প্রথমেই দেখতে হবে এই দায়িত্ব প্রকৃতই পালিত হচ্ছে কিনা। তারজন্য অন্তত সাত বৎসরের বাধ্যতামূলক কাজের স্কুল প্রবর্তন করা উচিত। সেগুলোকে যে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছি তা দিয়ে একটি সম্প্রদায়রূপে গড়ে তুলতে হবে। শুধু একপেশে পুঁথিগত শিক্ষাই সেখানে হবে না। তাকে রূপান্তরিত করতে হবে বাস্তব মানবিকতার পরিপূর্ণতায়। নিষ্ক্রিয় পুঁথি শিক্ষাকে রূপান্তরিত করতে হবে সক্রিয় উদ্দেশ্যমূলক কর্মপ্রেরণায়—যে কর্মের প্রেরণা হবে সুপরিকল্পিত, সততার সঙ্গে রূপায়িত, নির্মমভাবে সমালোচিত এবং উদার-ভাবে প্রশংসিত। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমের পর একে পরিপূরিত করতে হবে বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে। ১৮ বৎসর বয়াস পর্যন্ত সেখানে আংশিক সময়ের জন্য বাধ্যতামূলক উপস্থিতি রাখতে হবে। এই পরিকল্পনার দ্বারাই কেবলমাত্র সুদৃঢ় শিক্ষার ভিত্তিই নয়, সুদৃঢ় এবং সক্রিয় গণতান্ত্রিক সমাজেরও ভিত্তি স্থাপিত হবে।

এই কাজ রাষ্ট্রই গ্রহণ করবে। কিন্তু এর সাফল্য নির্ভর করবে বহুলাংশে শিক্ষক এবং ভারতীয় নাগরিকদের ওপর।

আজকের শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেক শিক্ষক হয়ত উপস্থিত আছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে প্রাথমিক বা বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা খুব বেশী হবে না। তাঁরা সাধারণতঃ বিজ্ঞানভবনে আসেন না। আকাশবাণীর সৌজন্যে আমার কথাগুলো বাইরের অনেক শিক্ষকদের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে, এ আশা

করি। কিন্তু সেখানেও প্রাথমিক কিংবা বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পৌঁছুবে না। তাঁরা সাধারণতঃ ইংরেজী বেতার বক্তৃতা শোনেন না। কিন্তু আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমি ছিলাম শিক্ষক। অবস্থার গুণে আমাকে কিণ্ডার গার্টেন থেকে শুরু করে প্রাথমিক, বুনিয়াদী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে হয়েছে। আমি শিক্ষাবৃত্তির মধ্যে একত্ব-বোধ অনুভব করতে শিখেছি। দুঃখের বিষয়, আমাদের এই জাতিভেদ-বিদীর্ণ সমাজ একে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে রেখেছে, যদি আমি কোনো যাদুমন্ত্রবলে শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত সকলের মধ্যে একত্ববোধ জাগ্রত করতে পারতাম, তাহলে আমার জীবন সার্থক হতো। কিন্তু সেই যাদুমন্ত্র আসবে কোত্থেকে?

আমাদের এই বিশাল দেশের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এবং এখানে যে সহযোগী শিক্ষকরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলতে চাই। নতুন কথা কিছু বলবার নেই। গত ত্রিশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে একথাই আমি বলে আসছি। বহু কণ্টার্জিত স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর জাতীয় মহত্ত্বের যে সৌধ নির্মাণকার্যে জনসাধারণ নিযুক্ত তাঁদের প্রতি সুমহান দায়িত্বের কথা আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নির্মুক্ত নৈতিক ব্যক্তিমানস রূপে সমাজের নৈতিক উন্নয়নের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব আছে। শিক্ষিত মানুষ রূপে তাঁদের একথা মনে রাখতে হবে যে সমাজের কল্যাণের শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধের তাঁরা হলেন তত্ত্বাবধায়ক। মানবজাতির সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার বিস্ময়কর সংমিশ্রণের প্রতিনিধি তাঁরা।

যদি তাঁদের মধ্যে কেউ এই সমস্ত মূল্যবোধের দ্বারা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হবার রমণীয় বেদনাবোধ উপলব্ধি করে না থাকেন তাহলে তাঁরা শিক্ষকরূপে গণ্য হতে পারেন না। যিনি কখনো এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হননি, যিনি অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও কখনো উচ্চতর মূল্যবোধ দ্বারা বিধৃত হননি কিংবা তার অভিজ্ঞতা হয়নি, যিনি নিজের ক্ষুদ্র সত্তার বাইরে অন্য যে কোনো প্রকার মূল্যবোধ সম্পর্কে উদাসীন অথবা তৎসম্পর্কে নৈরাশ্য অনুভব করেন তিনি কখনই শিক্ষকপদ লাভ করতে কিংবা শিক্ষকরূপে থাকতে পারেন না। শিক্ষক তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা এবং সংস্কৃতির বস্তুনিচয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে উচ্চতর মূল্যবোধগুলি সম্ভাবিত করতে সাহায্য করবেন। তিনি নিজে যদি সেগুলো সম্পর্কে অবহিত না হন, সেগুলোর অভিজ্ঞতা না হয় কিংবা সেই মূল্যবোধকে বাস্তবে রূপায়িত করবার দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে না থাকেন তাহলে তিনি ছাত্রদের মধ্যে সেগুলি কীভাবে জাগ্রত করবেন কিংবা সঞ্চারিত করবেন? তা ছাড়া ভাল

শিক্ষকের এই গুণ সমুদয় ছাড়াও একটি চরিত্র থাকতে হবে যাকে আমি আমার প্রথম বক্তৃতায় সামাজিক চরিত্র নাম দিয়েছি। তাঁর কাজের মূল উদ্দেশ্যই হ'লো তরুণদের মধ্যে মূল্যবোধ রূপায়িত করা। তাদের প্রতিভা ও প্রয়োজন উপলব্ধি ও সহানুভূতি দিয়ে বিচারের ফলেই এ কাজ সমাধা হতে পারে। তাঁর প্রধান কাজ হ'লো অপরিণত বিবর্ধমান জীবন নিয়ে, অংকুরিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে। ছাত্রের বৈশিষ্ট্য দিয়েই তিনি পরিচালিত হবেন। কীভাবে তিনি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করবেন। কুসুমকলিকে তিনি প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করবেন। নিজের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার জন্য কাগজের ফুল তৈরী করবেন না। তাঁর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও পরিণতি হলো নৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। ব্যর্থ অনুকরণ তৈরী করবার জন্য তিনি কখনই সংস্কৃতির বস্তুগুলোকে তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। প্রকৃত শিক্ষক সব সময়েই তাঁর ছাত্রদের অন্তরের নৈতিক স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তার ফলেই তারা এই অপূর্ণ সমাজের, যে সমাজে শিক্ষক ছাত্র উভয়ই বাস করেন, নৈতিক উন্নয়নের কাজে সাহায্য করতে পারবে। প্রত্যেক সৎ গণতান্ত্রিক সমাজই এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আগ্রহী। এই অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব শিক্ষককে পালন করতেই হ'বে, সমাজ যদি তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবার ভয় দেখায় তৎসত্ত্বেও। সক্রেটিস, খৃষ্ট, হুসেন ও গান্ধীর জীবন ব্যর্থ হয় নি।

শিক্ষক নির্দেশ দেবেন না, প্রভুত্বও করবেন না; তিনি সাহায্য ও সেবা করবেন। বিশ্বাস, ভালবাসা এবং শ্রদ্ধায় গড়ে তুলবেন, উপলব্ধি করবেন। ব্যক্তি ও গোষ্ঠির মধ্যে সঠিক বোঝাপড়া আনতে হলে প্রয়োজন তাঁর অসীম ভালবাসা, ও অফুরন্ত ধৈর্য। এই উভয় গুণেরই প্রকৃত গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। শিক্ষকই তার মধ্যে আনবেন সঙ্গতি। অন্যেরা নীতির গোঁড়ামি করবেন, শিক্ষক শুধু জানবেন। শিক্ষক জানেন যে ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি গণনার ইউনিট নয়, একটি পরিচয়পত্র অথবা সংখ্যা নয়। যে তরুণদের তিনি কর্মে, জ্ঞানে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন তারা যদি পূর্ণতর জীবন, আরও আরামদায়ক জীবন না চায়, তাহলে জীবন তো কাহিনীতে পর্যবসিত হবে।

অপর পক্ষে তিনি জানেন, গোষ্ঠি শুধুমাত্র ব্যক্তির সমষ্টি নয় কিংবা সংগঠনের উদ্দেশ্যে গৃহীত একটি ধারণা মাত্র নয়। তিনি জানেন ব্যক্তি জীবনকে উপলব্ধি করে গোষ্ঠির মাধ্যমে তাকে পরিবর্তনের শক্তি লাভ করে। কিন্তু এ সত্যও তিনি জানেন যে কত সহজে গোষ্ঠির ভাবধারাটিকে নিপীড়নের যন্ত্রে পরিণত

করা যায়। সুখী, মৃদু পায়ের তালে তালে চলা ও আক্রমণকারী সৈন্যদলের অশুভ পদক্ষেপের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। শিক্ষকের কাছে এই পার্থক্যই মূল্যবান। সুযোগ পেলে তিনি মানুষকে সাহায্য করবেন আনন্দে একসঙ্গে চলতে এবং কাজ করতে—অদম্য উৎসাহে নিজেদের সত্তার ঊর্ধ্বে লক্ষ্যে উপনীত হতে।

শিক্ষকবন্ধুগণ, বাইরের দিকে অনেক পরিবর্তন হলেও, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি আমি শিক্ষক সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে সেবার বোধ এবং শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে আমার একাত্মবোধই আমাকে আরও কিছুকাল এগিয়ে চলতে শক্তি জুগিয়ে আসছে। আমাদের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সাহসের সঙ্গে আমাদের এর সম্মুখীন হ'তে হ'বে। অন্যেরা আমাদের জন্য চিন্তা করে কিছু বের করবেন এবং আমরা যান্ত্রিকভাবে, হৃদয়হীনের মতো সেগুলোকে কর্মে রূপায়িত করবো তারজন্য যেন আমরা অপেক্ষা করে না থাকি। আমাদের একটি সুস্থ পেশাগত অভিমত, জাতীয় দায়িত্বের পেশাগত বোধ গড়ে তুলতে হ'বে।

আমরা শুধুমাত্র বেতনভুক নই, কোনোরকমে জীবিকার্জন করছি তা নয়। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর নিষ্ঠুর ভাগ্যের মতো আমরাও যদি না বুঝে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে আমাদের পক্ষে মূল্যহীন কাজ করে যাই তাহলে আমাদের জীবনের কোনো অর্থই থাকে না। আমাদের বুদ্ধিজীবী প্রেরণায় ও বস্তুগত নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। হাতের কাজকে দিতে হ'বে সামাজিক দায়িত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তির কাজকে দিতে হবে উদ্দেশ্যমূলক কাজের দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট ভিত্তি।

পরিশেষে ভারতের বিদ্যালয়সমূহের পক্ষ থেকে আমার দেশের নাগরিকদের কাছে কিছু নিবেদন করতে চাই। বন্ধুগণ, আমি প্রার্থনা করি আপনারা আমাদের বিদ্যালয়গুলোকে যথাযোগ্য স্থান দিন। স্কুল শূন্যে থাকতে পারে না। এটা হলো সমাজের অঙ্গীভূত এবং স্পর্শকাতর অংশবিশেষ। বিদ্যালয় তার চতুর্পার্শ্বস্থ সমাজ থেকে দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। আমি চাই আপনারা জীবনের সর্বপ্রচেষ্টায় পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার এমন প্রেরণা সৃষ্টি করেন যাতে স্কুলের সমাজ সহযোগিতার মনোভাব থেকে বিচ্যুত হতে লজ্জাবোধ করে। আপনাদের মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে উঠুক। যাতে ভবিষ্যতের তরুণ সমাজের মধ্যে এই মনোভাব গড়ে তুলবার সময়ে একথা তারা মনে করতে না পারে যে সমাজের বয়স্ক ও সক্রিয় সদস্যরা নিজেরা যা পরস্পরের প্রতি প্রদর্শন করেন না সেরূপ কিছু বিশেষ দাবী তাদের কাছে করা হচ্ছে।

সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশের অর্থ হলো প্রত্যেককে যথাযোগ্য ভাবে সমাজকে সেবা করবার সুযোগ দান। এটা যেন অনিচ্ছুক হস্ত থেকে জোর করে আদায় করা না হয়। স্বাধীনভাবে সেবা করা ও সানন্দে গ্রহণ করবার অধিকার এটা। আপনারা সকলে পারস্পরিক সম্প্রীতিতে ছোট কিংবা বড় গোষ্ঠীতে কাজ করুন, আমি অনুরোধ করবো। সে গোষ্ঠী ধর্ম কিংবা ভাষা কিংবা জাতি অথবা অন্য যে কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ স্বার্থপরতার জন্যই হোক না কেন। কোনো স্কুল কেবলমাত্র তার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্বার্থই দেখতে পারে কিংবা এমন দক্ষতা অর্জন করতে পারে যা শুধু নিজের ব্যক্তিগত উপকারেই প্রয়োগ করবে। যে সমাজ তাদের এত সুযোগ দিল তার জন্য কোনোই প্রতিদান নাও দিতে পারে। আমরা এমন স্কুল চাই না। এমনও হ'তে পারে যে, স্কুলে তরুণ বালক বালিকারা কিছুটা দক্ষতা অর্জন করল কিন্তু পরবর্তী জীবনে কেবল ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থের সেবা করল, বৃহত্তর মানবতার দাবী অনিচ্ছায় কিংবা স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করল। আমরা এমন স্কুলও চাই না। বৃহত্তর আনুগত্যের পরিবর্তে সংকীর্ণতর আনুগত্য আমরা সৃষ্টি করতে চাই না।

স্বভাবতঃই আপনারা এমন স্কুল চাইবেন যেখানে ব্যক্তিগতভাবে সদস্যরা স্বেচ্ছায় স্কুলের কাজের জন্য শৃংখলা মেনে চলবে। স্কুলকে এমনভাবে সংগঠিত করতে চাইবেন যাতে সামগ্রিকভাবে সকলেই বৃহত্তর মানবতার জন্য সেবা, মানবিক মূল্যবোধের সেবা এবং ভগবানের সেবায় অনুপ্রাণিত হবেন। এই সর্বব্যাপী আনুগত্যই সর্বোচ্চ মূল্যবোধরূপে সর্বাগ্রে আসা চাই। আমাদের জনগণকে, প্রতিবেশীকে ও সহযাত্রীকে সেবা করেই আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। এই কাজের জন্যই স্কুল আপনাদের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবে। আপনারা যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারেন, যদি আপনারা আপনাদের জীবন দিয়ে স্কুলসমাজকে একথা বোঝাতে না পারেন যে আপনাদের সহানুভূতি ও সেবায়, আপনাদের স্নেহ ও আনুগত্যে আপনারা ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ স্বার্থের সীমা অতিক্রম করতে পারেন, তাহলে অন্য সব কিছুই ব্যর্থ হবে।

আপনাদের দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে, আপনাদের সন্তানদের স্বার্থে আমি অনুরোধ করবো স্কুলের চারপাশে এমন জীবন গড়ে তুলুন, সেবা, আনুগত্য ও সহযোগিতার এমন পরিবেশ সৃষ্টি করুন যার মধ্যেই একমাত্র প্রকৃত বিদ্যালয়, প্রকৃত মানবতার মতোই গড়ে উঠতে পারে। আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের পুনর্গঠন এবং আমাদের জনগণের নৈতিক পুনরুজ্জীবন পরস্পর সম্পর্কিত। আসুন আমরা সাহসের সঙ্গে এই দুই কাজেই হাত দিই।

পরিশিষ্ট

[বক্তৃতার পর কতকগুলি প্রশ্ন করা হ'লে ডাঃ জাকীর হুসেন তার উত্তর দেন। নিম্নে প্রশ্নোত্তরগুলি দেওয়া হ'লো ঃ]

প্রঃ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, আমার মনে হয় বয়স্কদের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য, শিশুদের ক্ষেত্রে নয়। অধিকাংশ শিশুই এই ধরনের কোনো প্রবণতা দেখায় না। আসলে একই দিনে তারা কয়েকবার একরূপ মানসিক কাঠামো থেকে অন্য মানসিক কাঠামোতে পরিবর্তিত হয়। তাই শিশুদের বিভিন্ন কাঠামোতে ভাগ করে সেই ভিত্তিতে শিক্ষাসূচী প্রণয়ন করা কি যুক্তিযুক্ত ?

উঃ—আমি এ বিষয়ে একমত যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একটা নির্দিষ্ট রূপে আত্ম-প্রকাশ করতে কিছুটা সময় নেয়। তাই কোনো একটা মানসিক গড়ন অল্প-সময়ের জন্যও স্থায়ী হওয়ার আগে তাদের ওপর কোনো ছাপ মেরে দেওয়া শিক্ষানীতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক। তাহলেও বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলোচনা ব্যর্থ হয়নি। শৈশবেও এর উপযোগিতা পাওয়া যেতে পারে যদি এর দ্বারা শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়তা হয়। এই উদ্দেশ্যকে বলা যেতে পারে মনের সহজাত নির্দিষ্ট কাঠামো গড়নে ও উন্নতিবিধানে শিক্ষার দ্বারা সাহায্য করা। প্যারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির উপাদানকে এই শিক্ষা ও উন্নয়নকার্যে ব্যবহার করতে হয়। এর দ্বারা শিক্ষক স্কুলজীবনের গোড়াতেই শিশুদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ঝোঁক দেখতে পাবেন। সেই ঝোঁকটি হলো হাতে কলমে কাজ করবার ইচ্ছা, হাত ব্যবহার করবার অদম্য প্রবণতা এবং জিনিস গড়বার ও ভাঙ্গবার প্রবল ক্ষমতা। আমার বক্তৃতায় যে বিস্তারিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শ্রেণীবিভাগের বিষয় উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে এর সঠিক মিল না থাকলেও এগুলো শিক্ষকের চোখে পড়বে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সর্বজনীন গুণাবলীর অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হ'বে। কিন্তু সাধারণতঃ তা করা হয় না। শিক্ষাদান কালে এই বিষয়টির ওপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে প্রত্যেক মানবশিশুরই হাতেকলমে কাজ করবার প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। এই বয়সের শিশুরা, বলা যেতে পারে, হাত দিয়েই চিন্তা করে এবং কাজের মধ্য দিয়েই শিক্ষালাভ করে। তাদের এই প্রবণতা মানবেতিহাসেরই যেন পুনরাবৃত্তি। মানুষের বুদ্ধিজাত কার্যকলাপও গড়ে উঠেছে কায়িক শ্রমেরই মাধ্যমে। এই সুস্পষ্ট ঘটনার স্বীকৃতির অর্থই হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশতঃ এর বিচিত্রবৈশিষ্ট্য

এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। আমার প্রথম বক্তৃতায় তারই বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করতে চেয়েছিলাম।

আমার মনে হয় কার্শেনস্টেনার (Kerschensteiner)-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শ্রেণীবিভাগের দীর্ঘ সারমর্ম বিশ্লেষণ করে আমি প্রশ্নকর্তার ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রথম বক্তৃতায় দ্বিতীয় যে নীতি ব্যাখ্যা করেছিলাম সেটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি উল্লেখ করেছিলাম যে শিক্ষার প্রতিটি নির্দিষ্ট স্তরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্রমবিকাশের স্বীকৃতিদান করা উচিত। নিরবয়ব ও অস্পষ্ট রূপ থেকে শুরু করে ক্রমশঃ এই স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট আকার নেয়। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে সাত থেকে চৌদ্দ বৎসরের ছেলে মেয়েরা অভ্রান্তভাবেই বাস্তব কর্মপ্রেরণার পরিচয় দেয়। তাদের শিক্ষাসূচী তৈরী করবার সময় এর স্বীকৃতি অবশ্যই দেওয়া উচিত। শিক্ষার মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্য কার্যকর হবে।

প্রঃ—ভারতে, অন্ততঃ কাগজেকলমে, আমরা যে শিক্ষাসূচী গ্রহণ করেছি তার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশ। গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাসী। বিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব হ'লো দায়িত্বশীল, গণতান্ত্রিক নাগরিক ও সচেতন ও মননশীল ব্যক্তি গড়ে তোলা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে, এমনকি জার্মানীতেও, যে দেশ থেকে আপনি প্রেরণা লাভ করেছেন, শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির মধ্যে সেই স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারেনি যা সৎ প্রতিবেশীত্ব অথবা জাতীয় কিংবা বিশ্ব নাগরিকের আদর্শের অনুকূল। আপনি কি একথা মনে করেন না যে ব্যক্তির ওপর অতিমাত্রায় জোর দিয়ে আমরা অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতাকেই উৎসাহ দিচ্ছি? আমরা কী দিয়ে ব্যক্তির সামাজিক অগ্রগতির পরিমাপ করবো?

উঃ—এর আগের প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর দিয়েছি। তাই এই দীর্ঘ প্রশ্ন করে আমার প্রতি যথোচিত ব্যবহারই করা হয়েছে। প্রশ্নটির আমি বিভিন্ন ভাগ করে উত্তর দেবো।

প্রথম ভাগে 'অন্ততঃ কাগজেকলমে' কথাটি যুক্তিযুক্ত হয়নি বলেই মনে হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে পরে হয়তো আমরা ঘোষিত নীতি থেকে পশ্চাদপসরণ করেছি। যা ঠিক নয়। ভারতের বিদ্যালয় সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান আছে তাতে আমি একথা সাহস নিয়ে ঘোষণা করতে পারি না যে 'গণতান্ত্রিক নাগরিক ও সচেতন এবং মননশীল ব্যক্তি' গড়ে তোলবার দায়িত্ব ভারতের বিদ্যালয়গুলোর ওপর অর্পিত। যদি তাই হতো তাহলে আমার বক্তৃতায় আমি বিস্তারিতভাবে প্রকৃত শিক্ষার সারমর্মরূপে যা ব্যক্ত করতে চেয়েছি তা ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়ে

যেতো। প্রশ্নকর্তা যদি ঠিক তথ্য দিতেন তাহলে আমার চেয়ে বেশী খুশী কেউ হতেন না। কিন্তু আমার মনে হয় প্রশ্নকর্তা সঠিক তথ্য দেননি। প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন দেশে শিক্ষার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জার্মানীর নামোল্লেখ করে বলেছেন যে সে দেশ থেকে আমি শিক্ষানীতির প্রেরণা লাভ করেছি। তিনি বলেছেন যে সেই দেশগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা 'ব্যক্তির মধ্যে সেই স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারেনি যা সৎ প্রতিবেশীত্ব অথবা জাতীয় কিংবা বিশ্ব নাগরিকত্বের আদর্শের অনুকূল।' আমার মনে হয় এই মন্তব্য অসতর্কতাপ্রসূত ও অত্যন্ত ঢালাও ধরনের অভিমত। পৃথিবীতে অনেক দেশই তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি ভাল নাগরিকের প্রজন্ম গড়ে তুলতে সাফল্য লাভ করেছে। এবং সেগুলো শুধুমাত্র 'কাগজে কলমে' নয়। একথা অবশ্য ঠিক যে শিক্ষা বিশ্ব নাগরিকত্বের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টাও করা হয়নি। যাই হোক, একটা বিষয় যেন আমরা ভুলে না যাই, যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মানব আচরণ নির্ধারণের অন্যতম উপাদান মাত্র। এবং সেটিকেও সবচেয়ে শক্তিশালী বলা যায় না। কিন্তু কে সাফল্য লাভ করলো কিংবা কে করলো না, সেটা আলোচ্য বিষয় নয়। বিচার্য বিষয় হ'লো আমরা কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চাই এবং কীভাবে তা সম্ভব হ'তে পারে। অন্য দেশের তথাকথিত ব্যর্থতা অথবা অন্ততঃ কাগজেকলমে আমাদের কল্পিত সাফল্য সত্ত্বেও।

জার্মানী থেকে প্রেরণালাভের যে কথার উল্লেখ প্রশ্নকর্তা করেছেন, তদুত্তরে আমি এই অভিযোগ স্বীকার করছি। জার্মাণ চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং আমি সানন্দে তা স্বীকার করছি। অবশ্য এতে একথা বোঝায় না যে আমার চিন্তাধারার বিকাশে অন্য কারো কাছে আমি ঋণী নই। সুইস, বৃটিশ এবং মার্কিন শিক্ষাবিদদের নিকট যেমন, ভারতীয় শিক্ষাবিদদের নিকটও আমি তেমনি কিংবা তার চেয়েও বেশী ঋণী। সত্য ও জ্ঞানকে আমি আমার হৃত সম্পত্তি মনে করি এবং যেখানেই তার সন্ধান পাই কুড়িয়ে নিই।

প্রশ্নের তৃতীয় ভাগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর অত্যধিক জোর দিলে আত্ম-কেন্দ্রিকতার বিপদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার মনে হয় ব্যক্তি (individual) শব্দটিই প্রশ্নকর্তাকে বিশেষভাবে বিভ্রান্ত করেছে। সব মানুষই ব্যক্তি। মানুষের মন হ'লো ব্যক্তিমানস। পরার্থকামী ব্যক্তি, সামাজিক ব্যক্তি, বস্তুকেন্দ্রিক ব্যক্তি, বহুকেন্দ্রিক ব্যক্তি, সকলেই আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির

মতোই ব্যক্তিবিশেষ। তাই 'অত্যধিক জোর' দেবার প্রশ্নটি এখানে অবান্তর। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তিতে স্বাধীন নৈতিক ব্যক্তিত্বের সৌধ গড়ে তোলা যায় স্বীকৃতিকে 'অত্যধিক জোর' দেওয়া বলা চলে না। এ হলো স্পষ্টতঃগ্রাহ্য অথচ অবহেলিত একটি সত্যের স্বীকৃতি। কারণ, বাস্তব ঘটনানুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতিকে ব্যক্তির দিকেই নিজেকে নিযুক্ত করতে হ'বে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবর্তনের কোনো কোনো ধাপে যুক্তিসঙ্গত-ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে অনুরূপ মানসিক কাঠামোর বিষয়গুলির সঙ্গে সমীকরণ করা হয়। সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই একান্ত নির্ভরশীলতাই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ব্যক্তির মানসিক উন্নয়নের জন্যই সমাজ এই সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে পরিবেশন করে। শিক্ষায় ক্রিয়াপদ্ধতির নীতি বিশ্লেষণ করবার সময়ে আমি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি যে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি একাত্ম করবার কালে যে দক্ষতা ও গুণা-বলী অর্জিত হয় সেগুলোকে বিষয়ানুগ মূল্যবোধের কাজে ব্যবহৃত হলেই তাকে শিক্ষা নাম দেওয়া যেতে পারে। আমি একথাও বলেছি যে শিক্ষা হ'লো সমাজের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী দ্বারা উদ্বুদ্ধ এইরূপ মূল্যবোধের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে সংগঠিত অনুরক্তি। এই অনুরক্তিই সামাজিক ক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশ করে।

আমি আরও বোঝাতে চেয়েছি যে সমস্ত শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য এবং একে আমি শিক্ষার সামাজিক দায়িত্বরূপে অভিহিত করেছি। আমি যে পঞ্চম নীতি বিশ্লেষণ করেছি তাতে বলেছি যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'লো উন্নততর, ন্যায্যতর এবং অধিকতর সুন্দর জীবনযাত্রার প্রতি সমাজের ক্রম বর্ধমান আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিমানসের পূর্ণ পরিণতি এবং সামগ্রিক সামাজিক অস্তিত্বের নৈতিক শক্তি ও উন্নয়ন পরস্পর সহযাত্রী। আমার দ্বিতীয় বক্তৃতায় এ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছি যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠনে ব্যক্তি ও সামাজিক পারস্পরিকতার নীতির প্রতি প্রায়ই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। সেজন্যই আমি চেয়ে-ছিলাম আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সমষ্টিগত জীবনযাপন, সমষ্টিগতভাবে কায়িক ও মানসিক কাজকর্মের এবং সর্ববিধ শ্রেয় মূল্যবোধ ও উন্নতির সম-অংশভাগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক। আমি সুস্পষ্টভাষায় তাই বলতে চাই, 'এই নীতি যতদিন আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের জীবনবায়ুরূপে পরিগণিত না হচ্ছে, ততদিন অন্য সমস্ত সংস্কারসাধনই হ'বে জোড়াতালির কাজ।' আমার বক্তৃতার এই প্রসঙ্গটি প্রশ্নকর্তা ধরতে পারেননি এতে আমি বিস্ময়বোধ করছি। আশা করি এই ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

প্রঃ—শিক্ষার নিম্নতর পর্যায়ে সঙ্গীত, নৃত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের কি স্থান থাকা উচিত? যদি থাকে, তাহলে কী ভাবে সেগুলো প্রবর্তিত হ'বে?

উঃ—ইস্কুলে গান, নাচ ও শিল্পকলার স্থান অবশ্যই থাকা উচিত। শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ বক্তব্যই একে সমর্থন করে। কারণ এই সাংস্কৃতিক কার্যকলাপই ব্যক্তিমানসের অনুশীলনে সহায়তা করে। শিশুদিগকে এই সাংস্কৃতিক উপাদানের সুযোগ দিতে হ'বে। আমি শুধু এই অনুরোধ করবো যে, প্রাথমিক পর্যায়ে, ভারতীয় জীবন থেকেই যেন প্রধানতঃ এই সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক মানসিক গঠনের উপযোগী সাংস্কৃতিক উপাদান দিয়েই মনের প্রকৃত চর্চা সম্ভব, একথা যদি স্বীকার করি তাহলে এটা স্পষ্টতঃই স্বীকার্য যে জাতির যে মানুষ, সেই জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণই মনকে অনুশীলনের সাহায্যে শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। যুগের পর যুগ এমন কোনো শিক্ষাব্যবস্থা আমরা প্রবর্তন করতে চাই না যা ভারতীয় শিল্পকলা, সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার সৌন্দর্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন। কিন্তু যে মনকে শিক্ষিত করে তোলা হ'বে তার সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক উপকরণ দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হ'বে তার সামঞ্জস্য ভুললে চলবে না। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে বর্ণান্ধকে চিত্রকলার মাধ্যমে এবং বধির অথবা সঙ্গীতবিমুখকে সঙ্গীতের মাধ্যমে শিক্ষা দানের অসম্ভব দায়িত্ব যেন আমরা গ্রহণ না করি।

আমি যা বলেছি তা সহজবোধ্য হওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় যে হাতের কাজ এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের দুইটি বিভাগকে বিশ্লেষণ করবার জন্যই এই প্রশ্ন করা হয়েছে। আমি এই যথেচ্ছ বিভাগ স্বীকার করি না। একটি ভাল টেবিল তৈরীর জন্য কাজ অথবা ব্যবহারোপযোগী কাপড় বোনা, ভালভাবে সেতার বাদনের চেষ্টা, অঙ্কের একটি দুরূহ প্রশ্ন সমাধান, কোনো একটি নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং একটি গান গাওয়া, আমার কাছে এ সমস্তই সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ। নিজেদের গণ্ডীতে এ সমস্তই শিক্ষণীয় হ'তে পারে। স্কুলে শিল্পকলা এবং সঙ্গীত প্রবর্তনে আমার দ্বিধা নেই; আমি একে স্বাগত জানাই। স্কুলে প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল কাজ যদি সযত্ন পরিকল্পিতভাবে প্রবর্তন ও আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়, খোলাখুলিভাবে তার সমালোচনা ও অকুণ্ঠভাবে তার প্রশংসা হয় তাহলে অন্যদেরও আতঙ্কিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রঃ—বুনিয়াদী শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে তা এক্ষুণিই বন্ধ করছেন না কেন? অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

উঃ—অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের বুদ্ধিকে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কোনো সত্যিকারের অভিজ্ঞতা ছাড়াই বুদ্ধিমান হবার দাবী মানতে আমি রাজী নই। কোনো বিষয় যাচাই করে না দেখে আমি সে সম্পর্কে গোঁড়া অভিমত প্রকাশ করবার আগে সতর্ক হই; তার বিরুদ্ধে কোনো গোঁড়ামির ব্যবস্থা গ্রহণে তো আরও অনিচ্ছুক। যদি দেখি কোনো পরিকল্পনা কিংবা কর্মপদ্ধতি যথার্থই সুষ্ঠু এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অংশতঃও যদি তার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়, তাহলে সে পরিকল্পনাকে খোলা মন নিয়ে সম্পূর্ণ কার্যকরী করতে আমি আগ্রহী হই। আমি দেখতে চাই কীভাবে সে পরিকল্পনা কাজ করে; তার দ্বারা আমার অভিমত সমর্থিত হয় কিংবা তার বিরুদ্ধতা হয়। আমার মনে হয় কোনো কাজে অগ্রসর হওয়ার এই একমাত্র পথ। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা, সততা এবং একটু ধৈর্য।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার অভিমত যা ছিল এবং এখনও যা আছে তা হলো, এই শিক্ষা পরিকল্পনা যথেষ্ট সুষ্ঠু এবং একে বাস্তবে রূপায়িত করা মোটেই অসম্ভব নয়। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে এই পদ্ধতি সাফল্যজনক ভাবে কাজ করে। তবে সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে এর প্রয়োগ সম্পর্কে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তা থেকে বলতে পারি যে একে যথাযথভাবে পরীক্ষা করবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। এর মূল ভাবধারাগুলোকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি, একে বাস্তবে প্রয়োগ করবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও করা হয়নি; যাঁরা এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁরা যথার্থ একনিষ্ঠভাবে ও আগ্রহ নিয়ে দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেননিঃ শিক্ষক ও ইনস্পেক্টরদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হয়নি; বুনিয়াদী ও অ-বুনিয়াদী স্কুল সমপর্যায়ে কাজ করবার ফলে যে দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব ছিল তাতেই শিক্ষানীতি নির্ধারকদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। অনেক জায়গায় বুনিয়াদী স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সুষ্ঠু ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক না থাকায় এমন একটা মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে বুনিয়াদী শিক্ষা, আত্মসন্তুষ্ট ও কর্মহীন প্রশান্তির রাজ্যে বিরক্তিকর অনুপ্রবেশমাত্র। এই ধরণের আরও অনেক কারণের ফলেই বুনিয়াদী শিক্ষা যথাযথভাবে কাজ করবার সুযোগ পায়নি। সৎভাবে পরীক্ষা করবার আগে এমন একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা যা স্পষ্টতঃই সুদৃঢ় শিক্ষানৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায় কী করে? আমি এমন ধারণা সৃষ্টি করতে চাই না যে এক্ষেত্রে কোনো কিছুই করা হয়নি। অনেকদূর পর্যন্ত চেষ্টা

করা হয়েছে। ভাবধারা যতই বিশ্লেষণ করা হ'বে এবং সংস্কার দূর হবে, এ-সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই করা হবে। আমার কাছে শিক্ষা হ'লো ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা চারাগাছের মতো। প্রশ্নকর্তা যেন ছুটে গিয়ে অবিলম্বে তার শিকড়শুদ্ধ উপড়ে না ফেলেন। একথাও যেন তিনি মনে রাখেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যে আগাছার ভীড় হয়েছে তাকে কি আমরা অবিলম্বে বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। সুস্থ চারাগাছ হিসাবে এদের ব্যর্থতা তো সর্বজনবিদিত। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা চলে না। সততার সঙ্গে একে কাজ করবার সুযোগ দেবারই অপেক্ষা।

প্রঃ—সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংবাদ থেকেই আজকালকার ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর কারণ কী?

উঃ—সংবাদপত্রে যে সমস্ত বিবরণকে প্রশ্নকর্তা ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন বলছেন তাতে অত্যধিক আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক ঘটনা তো সাধারণ, অস্বাভাবিক ঘটনাই চাঞ্চল্যকর এবং তা বিক্রী হয়। সে কারণে, সংবাদপত্র সাধারণ ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহী নয়। অস্বাভাবিক ঘটনাই তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে। প্রশ্নকর্তার নিজের অভিজ্ঞতা যদি এই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোকেই সাধারণ বলে প্রমাণিত করে থাকে তাহলে অবশ্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। সংবাদপত্রে যেরূপ হতাশাব্যঞ্জক চিত্র পরিবেশন করা হয় তার সঙ্গে একমত না হলেও, প্রশ্নকর্তার এই উদ্যোগের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে যে নৈতিক ও জ্ঞানের উন্নতির দিক থেকে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কিছুটা অক্ষমতা রয়েছে। নৈতিক ও জ্ঞানের মান নিম্নমুখী একথা স্বীকার্য। এর কারণ বিশদভাবে আলোচনা করতে গেলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা দরকার। এখানে সে সুযোগ নেই। তবে কতকগুলি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

(১) সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগের দ্রুত প্রসার হয়েছে। কিন্তু সেই সম্প্রসারণকে কার্যকর করবার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি করা হয়নি। ফলে স্কুল কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই, শিক্ষার মানও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য বিপুলসংখ্যক অর্ধ-শিক্ষিত, স্বল্পবেতনভোগী শিক্ষক নির্বিকার ভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে।

(২) বর্তমান শিক্ষা কর্মসূচী শিক্ষার্থীদের মানসিক উন্নয়নের স্তর এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের প্রতি সাধারণভাবে উদাসীন। এর ফলে শিক্ষা একটি অবাস্তব ও অপ্রধান কার্যে পরিণত হয়েছে।

(৩) যখন শিশুর পক্ষে স্পষ্টতঃই প্রয়োজন শিক্ষাবিষয়ক কাজকর্ম, তখন শিক্ষার জন্য তত্ত্বগতভাবে সাহিত্যবিষয়ক সাংস্কৃতিক উপকরণ পরিবেশনের একপেশে সিদ্ধান্ত।

(৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে মনের সামাজিক ও বাস্তবানুগ দিকগুলোর চর্চার ব্যবস্থার অভাব।

(৫) বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে একই মানসিক কাঠামোর নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধধরণের যে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য হ'লো বেশিমাত্রায় তথ্য পরিবেশন করা। তাদের শিক্ষাগত মূল্য সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এই পরীক্ষার বোঝার চাপে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কর্মপ্রেরণা ও স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা প্রকাশের সুযোগের অভাব।

(৬) সক্রিয় অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নিষ্ক্রিয় গ্রহণক্ষমতার উপর জোর দেওয়া।

(৭) বর্তমানে যে ধারণা প্রচলিত আছে যে স্কুল ও কলেজগুলো কেবলমাত্র শিক্ষাদানেরই কেন্দ্র, সমষ্টিগতভাবে বাস করবার ও কাজ করবার কেন্দ্র নয়। আরও অদ্ভুত ধারণা আছে যে এই শিক্ষালাভে কোনো দায়িত্ব নেই, দেখবারও কেউ নেই। নিয়মানুবর্তিতা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, অন্তর্দৃষ্টি কিংবা বোঝাপড়ার ফলে স্বেচ্ছায় একে গ্রহণ করা হয়নি।

আরও কারণ উল্লেখ করতে পারি। তবে এগুলো পর্যালোচনা করলেই শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধনের জন্য সকলকে চিন্তা করতে হবে। শুধুমাত্র জোড়াতালি দিয়ে এই গলদ দূর করা যাবে না। সে কারণেই আমি বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন করেছিলাম 'শিক্ষা পুনর্গঠনের নীতি'। আমার ধারণা, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কোনোদিক দিয়েই আশাপ্রদ নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হ'লে গভীরভাবে চিন্তা করে সাহস ও একাগ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে হ'বে। তাহলেও হয়তো সংবাদপত্রে কিছু খারাপ রিপোর্ট বেরোবে। তবু তখন সহজভাবেই সেগুলো পাঠ করতে পারবো।'

প্রঃ—এখন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার উদ্দেশ্য, বয়সগোষ্ঠি, পঠনক্রমের দৈর্ঘ্য, পাঠ্যসূচী ও শিক্ষার মাধ্যম আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে দেখে একজন অভিভাবক হিসাবে আমি চিন্তিত। গবেষণার ভিত্তিতে অগ্রগামী নমুনা হিসাবে শিক্ষার কাঠামো পরিবর্তনের জন্য পরীক্ষা চলতে পারে। কিন্তু এখন যেভাবে সমস্ত কিছুরই উপর পরীক্ষা চলছে সেটা আশংকাজনক এবং দায়িত্বহীন বলে মনে হয়। আমি কি ভুল বলেছি?

উঃ—আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। আপনি ভুল বলেননি। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা ও পরীক্ষাকার্যের প্রবর্তনে অধৈর্য হলে চলবে না। এটা অপরিহার্য। মানুষ আসলে পরীক্ষাপ্রবণ প্রাণী। কিন্তু আপনি নূতন পরীক্ষানিরীক্ষায় অসহিষ্ণু নন দেখছি। আপনার আশংকা, শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন করা হচ্ছে তার জন্য। আমি এই তাড়াহুড়ার জন্যও অস্বস্তি বোধ করতাম না; যদি আমি এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত হতাম যে এই পরিবর্তন সাধনের আগে যথেষ্ট চিন্তা ও প্রস্তুতি করা হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রটি ছিল বদ্ধ জলাশয়ের মতো। এখন কিছু করবার স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত বেশী নূতন চিন্তাধারা এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছে যে এর ঢেউ পরস্পরের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা বিভ্রান্তিকর জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার দায়িত্ব যাঁদের উপর তাঁরা দেখাতে চান যে নূতন চিন্তাধারাকে তাঁরা উপেক্ষা করেন না। যে চিন্তাধারা যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়নি তাকে গ্রহণ করাই সবচেয়ে সহজ কাজ।

এই ধরণের পরীক্ষা ফলাও করে কাগজে প্রকাশিত হয়। সবাই মনে করেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট কিছু হচ্ছে। প্রায়ই দেখা যায় এতে মিথ্যা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব সৃষ্টি হয়। আমার নিজের ধারণা এই যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে কয়েকটি ফলপ্রদ চিন্তাধারা আছে। কিন্তু এগুলোকে কার্যোপযোগীভাবে বাস্তবে রূপায়ণের মতো উৎসাহ, প্রেরণা, প্রস্তুতি ও আন্তরিকতা একটির পশ্চাতেও নেই। কেবলমাত্র আলোচনা কিংবা কাগজেকলমে লিখলে অথবা প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেই কোনো চিন্তাধারা কার্যে রূপায়িত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন বহুলোকের সযত্ন ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। রূপায়ণের পরেও সতর্কভাবে ও অবিচলিতভাবে একে অনুসরণ করতে হয়; অপরিহার্যভাবেই এর অনেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয়। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে এর অনেক প্রয়োজনীয় শর্তাদিই উপেক্ষিত হয়। এর ফলেই অস্বস্তির সৃষ্টি। আমি আশা করি আমাদের নূতন দায়িত্ব পালনে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে এবং নিখুঁতভাবে সেগুলোকে রূপায়ণের শিক্ষা গ্রহণ করলে এই আশংকা কমে যাবে এবং তার কারণও আর থাকবে না। এই অন্তর্বর্তীকালে আমাদের ধৈর্য ধরতে হ'বে।

প্রঃ—আপনি বলেছেন যে শিক্ষা হ'লেও সাংস্কৃতিক বস্তুর সংস্পর্শে এসে তরুণদের নিজস্ব মূল্যবোধগুলির উন্নয়ন সাধন। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছামত সাংস্কৃতিক বস্তু পরিবেশন করতে পারেন। ফলে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তরুণদের মানসিক উন্নয়নের বিকৃতি সাধন করতে

পারেন। এই বিকৃতির কি স্বাভাবিক ক্ষতিপূরণ কিছু আছে, না কেবলমাত্র ক্ষমতা থেকে এই ধরণের ব্যক্তিদের উচ্ছেদ করেই তা আনতে হ'বে যা সব সময় সম্ভব নয়?

উঃ—স্বাধীন নৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলবার পথ হ'লো সমপন্থী মনের সৃষ্টি ও শ্রেয় মূল্যবোধের প্রতীক সাংস্কৃতিক উপাদানের সক্রিয় সংস্পর্শে এসে মনকে নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া। যে সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা আছে সেখানেই এই পদ্ধতি সম্ভব। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যই তাই। আমি এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতিগুলি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য এমন কপট-শিক্ষা প্রচেষ্টা থাকতে পারে যার উদ্দেশ্য স্বাধীনভাবে মনের উন্নয়ন নয়। বরং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তৈরী কাঠামো ও বাইরের দিক দিয়ে নির্ধারিত গড়ন জোর করে চাপিয়ে দেওয়াই যার লক্ষ্য। একথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের ইতিহাস স্বাধীন মানুষ ও শৃংখলা বদ্ধ মানুষের এক বৈচিত্র্যময় কাহিনী। মাঝে মাঝেই মানুষ পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে। ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ তার জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ এবং ইচ্ছার উপর জোর খাটিয়েছে অত্যন্ত কুৎসিৎ কর্তৃত্বলিপ্সার নগ্নতায়। কিন্তু এরই মধ্যে অনেকবার মানুষ জয়ী হয়েছে, শৃংখল ভেঙেছে. সানন্দে ও আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে পথ চলেছে যা চরিত্রের অনুশীলনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থেকে পৌঁছয় ব্যক্তিত্বে। সর্বময় ক্ষমতাভোগী নীতিহীনদের হাতে শিক্ষা পরিচালনার ক্ষমতা মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে বিপজ্জনক অস্ত্র-বিশেষ। এইরূপ স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বকামীদের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা শিক্ষানৈতিক প্রশ্ন নয়; এটা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং প্রশ্নটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যে ধরণের বিকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন তার স্বাভাবিক ক্ষতিপূরণের পথ অবশ্য আছে। কিন্তু একে রূপায়িত করতে অনেক সময় লাগে এবং বেশ কষ্টসাধ্য। মানুষের মধ্যে যে দিব্য সত্তা, যে সৃজন-শীল স্বতঃস্ফূর্ততা বিরাজমান সেই প্রেরণাই এই অমানবিক বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হয়তো প্রায়ই এর পরাজয় ঘটে কিন্তু একাগ্রনিষ্ঠার জন্য পরিণামে হয় জয়ী। বাহ্যতঃ যা অসম্ভব সে প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, এই প্রেরণা, যা প্রকৃতই সম্ভব তাকে আবিষ্কার করে। তখন শৃংখল যায় ভেঙে, মানুষ তখন স্বাধীনতার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে এগিয়ে চলে উন্নতির দিকে। প্রকৃত শিক্ষা পুনরায় সম্ভব হয়ে ওঠে।"